ঘন অন্ধকারের খোঁজে

মুহসীন মোসাদ্দেক রাজু

তৃতীয় নয়নে
একটি সৃজনশীল সাহিত্য প্রকাশন

প্রকাশক : মোস্তাফিজুর রহমান লিটন ◆ তৃতীয় নয়ন প্রকাশন ◆ যোগাযোগ : মার্ক আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ : বাড়ি # ১৩ : রোড # ২ : নিকুঞ্জ # ২ : খিলক্ষেত : ঢাকা-১২২৯ ◆ মুঠোফোন : +৮৮ ০১৭২৬ ০৪৭ ২২৭ ◆ শব্দগ্রন্থন : টিপু : পপুলার প্রিন্ট প্যালেস : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ◆ প্রচ্ছদ : আসাদ রাংগা ◆ গ্রন্থস্বত্ব : গল্পকার ◆ মুদ্রণে : এ্যাড বাংলা প্রিন্টার্স : নীলক্ষেত ঢাকা ◆ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০ ◆ পরিবেশক : *রেনেঁসা বুকস এন্ড স্টেশনারি* রাজউক ট্রেড সেন্টার (নিচতলা) : দোকান ১০ নিকুঞ্জ ২ খিলক্ষেত ঢাকা : *মেসার্স তাওহীদ বিপণী* চৌগাছা বাজার যশোর : *ইউনিভার্সিটি বুকস এন্ড স্টেশনারি* কাজলা গেইট রাজশাহী বিশ্ববিধ্যালয় : *ডেল্টা স্টেশনারি* রোড ১ নিকুঞ্জ ২ খিলক্ষেত ঢাকা : *আল ফাতাহ লাইব্রেরি* কানসাট শিবগঞ্জ চাঁপাই নবাবগঞ্জ : *বইবাগান* বাগাতি পাড়া নাটোর : *শেখ বুক ডিপো* খাজুরা বাজার বাঘার পাড়া যশোর : *বুক প্যালেস* বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোড কোলকাতা ◆ বিনিময় : একশত টাকা

GHONO ANDHOKARER KHOJE A Collection of Bengali Story by MUHSIN MOSADDEQ RAJU ◆ Publisher : MOSTAFIZUR RAHMAN LITON of TRETYA NAYAN in Marq Ideal School and College ◆ House # 13 Road # 02 Nikunja # 02 Khilkhet Dhaka 1229 Bangladesh ◆ First Published : February 2010 ◆ Price : Tk.101 : Rs.100: ◆ Contact : +88 01726 047 227 ◆ Net : www.litonru@yahoo.com ◆ ISBN : 978-984-33-1223-5

উৎসর্গ

আব্বা **মোঃ মুহসীন আলী**
আমার কাছে যিনি পৃথিবীর
সবচেয়ে সৎ মানুষ
আম্মা **মোসাঃ মনোয়ারা বেগম**
আমার কাছে যাঁর চেয়ে
মমতাময়ী পৃথিবীতে আর
কেউ নেই
প্রিয় **আসাদ রাংগা** ভাই
যিনি হাত বাড়িয়ে না দিলে
হয়তো এই বই বের হবার
কোনো সম্ভাবনা ছিলো না

সূচি

জ্বর	৭
ঘুম	১১
ক্ষুধার জ্বালা	২৫
হিসাব না মেলে	৩০
স্বপ্নলোকে শোকের হানা	৪৩
ঘন অন্ধকারের খোঁজে	৫২
একজন পুরুষের কান্না	৬৯

জ্বর

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রিমা। মোটাসোটা একটা কম্বল জড়িয়ে আছে গায়ে। তার খুব জ্বর, সাথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। গত রাতে হঠাৎ তার জ্বর এসেছে। মাঝে মধ্যেই আসে। বিশেষ করে আজকের এই বিশেষ দিনে সব সময়ই আসে। গত ছয় বছর ধরে এরকম হচ্ছে।

রিমার আম্মু ঘরে এসে তার পাশে বসলেন। রিমা চোখ খুলে তাকাল। আম্মু বললেন, 'এখন কেমন লাগছে মামনি?'

রিমা কথা বলল না। শুধু মুখে 'উঁ' করে একটু শব্দ করল।

'এখন কেমন লাগছে মামনি? একটু উঠে বসবে?'

'না।' রিমা কাতর কণ্ঠে বলল।

'কিছু খাবি না মা?' রিমার আম্মুও কাতর কণ্ঠে বললেন।

'না।'

'একটু সেমাই না হয় নুডুলস্ নিয়ে আসি? একটু খাও মামনি।'

'না, আমার ভালো লাগছে না।' আরো কাতর হয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল রিমা।

আম্মু রিমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'এ দিনে তোর কি যে হয়! কিচ্ছু বুঝি না। কোথায় আজকে আনন্দ করে বেড়াবি তা না ছয় বছর ধরে এই দিনেই জ্বর বাঁধিয়ে বসে থাকছিস। কেন এই রকম হয়রে মা!'

আম্মুর কাঁদো কাঁদো গলা শুনে রিমা ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কেঁদে উঠল।

'একটু কিছু খা মা। নিয়ে আসি?' কাঁদো কাঁদো গলাতেই বললেন আম্মু।

রিমা কোনো কথা বলল না। আম্মু চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। তারপর একটা ট্রেতে একটু সেমাই, একটু নুডুলস্ এবং রিমার প্রিয় চকলেটকেক নিয়ে আসলেন।

আম্মু রিমার পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ওঠ মা, একটু খেয়ে নে।'

রিমা আবারো কাতর গলায় বলল, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না, খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'একটু কিছু মুখে দে মা, ভালো লাগবে। না খেয়ে থাকলেই বরং আরো খারাপ লাগবে। ওঠ মা, একটু খা।'

রিমা এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত উঠে বসল। আম্মু তাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিলেন। আম্মুর কথা রাখতেই কেবল সে খেল, মোটেও মজা করে খেল না।

খাওয়া শেষে সে আবার শুয়ে পড়ল। আম্মু বাকি খাবার রেখে এসে আবার রিমার পাশে বসে তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

কলিংবেল বেজে উঠল। আম্মু দরজা খুলতে উঠে গেলেন।

রিমার চার বান্ধবী এসেছে–জুলি, অর্ণা, মেঘলা আর মুন্নি।

আম্মু দরজা খুলতেই জুলি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আন্টি রিমা কি করছে? ও নাকি আবার জ্বর বাঁধিয়েছে?'

'হ্যাঁ মা, গতকাল রাত থেকে আবার জ্বর এসেছে। যাও, ও ঘরেই আছে।'

ঘরে ঢুকেই জুলি বলল, 'কিরে রিমা, তুই নাকি আবার জ্বর বাঁধিয়েছিস?'

রিমা কোনো কথা বলল না। ধীরে ধীরে উঠে বসল। রিমার চার বান্ধবী তাকে ঘিরে বসল।

জুলি ধমকের সুরে বলল, 'কিরে, তুই আবার ঈদের দিনে জ্বর বাঁধিয়েছিস!'

'আমি বাঁধায় নি, নিজে থেকেই বেঁধেছে।' কাতর কণ্ঠে বলল রিমা।

অর্ণা বলল, 'প্রতি ঈদেই কেন তোর জ্বর আসে!'

'আমি কি জানি।'

'তুই আবার ইচ্ছে করে জ্বর বাঁধাস না তো!' মেঘলা বলল।

'ইচ্ছে করে জ্বর বাঁধানো যায় কিভাবে?' রিমার কাতর প্রশ্ন।

'বগলে একটা রসুন গুঁজে দশ মিনিট রোদে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো জ্বর চলে আসে।' মুন্নি বলল।

'তুই কখনো এভাবে জ্বর বাঁধিয়েছিস?' আবারো রিমার কাতর প্রশ্ন।

'স্কুল ফাঁকি দেয়ার জন্য কতদিন আমি এভাবে জ্বরের অভিনয় করেছি!' মুন্নির চটপট উত্তর।

'ঈদের দিনে কখনো এমন করেছিস?' রিমা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মুন্নির দিকে তাকিয়ে থাকল।

মুন্নি মুখটা একটু কাচুমাচু করে বলল, 'না, ঈদের দিনে তো এরকম করি নি। ঈদের দিনে কেউ এরকম করে নাকি?'

'তাহলে তোদের কেন মনে হচ্ছে আমি ইচ্ছে করে ঈদের দিনে জ্বর বাঁধিয়ে বসে থাকি?' মেঘলার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রিমা।

জুলি বিছানায় একটা থাবা দিয়ে বলল, 'তাহলে গত ছয় বছর ধরে প্রতি ঈদের দিনে কেন তোর জ্বর আসে?'

'আমি তার কি জানি।' রিমা একেবারে নিচু স্বরে বলল।

রিমা স্বযত্নে ইতিহাসটা এড়িয়ে গেল। সবার কাছ থেকেই সে এড়িয়ে যায়, সব সময়ই। নিজের কাছ থেকেও যদি সে ইতিহাসটা এড়িয়ে যেতে পারত!

রিমা তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। সে একটা ভাইয়ার কাছে প্রাইভেট পড়ত। সাগর ভাইয়া। বাসায় এসে পড়াতো। ভাইয়াটা খুব মজা করে কথা বলতো, খুব মজা করে পড়াতো। রিমা খুব মজা পেত, খুব ভালো লাগতো ভাইয়াকে। ভাইয়ার সাথে রিমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেল, আব্বু-আম্মুর সাথেও বেশ ভাব হয়ে গেল ভাইয়ার। ভাইয়া তখন রিমার সত্যি সত্যি ভাইয়া হয়ে হয়ে গেল, আর প্রাইভেট টিউটর থাকল না।

রোজার ঈদের দুইদিন আগে ভাইয়ার পরিবারের সবাই চলে গেল গ্রামের বাড়ি। শুধু ভাইয়া গেল না। একা বাড়িতে থেকে গেল। তাঁর কি যেন একটা কাজ আছে।

ঈদের আগেরদিন ভাইয়া রিমাদের বাসায় এলো, বলল, 'রিমা-মনি কাল আমি নিজে সেমাই রান্না করব। তোমাকে দাওয়াত দিতে এলাম। তুমি কাল সকালে অবশ্যই যাবে আমার বাসায়।'

'সেকি ভাইয়া, আপনাদের বাসায় তো কেউ নেই। আপনারই তো আমাদের বাসায় চলে আসার কথা।'

'আরে, আমি তো আসবই। তোমাকে একটা স্পেশাল দাওয়াত দিতে ইচ্ছে হল। আমি নিজ হাতে সেমাই রান্না করে তোমাকে খাওয়াব। কাল সকালে অবশ্যই তুমি আমার বাসায় যাবে। না গেলে কিন্তু আমি রাগ করব।'

'আরে ভাইয়া, রাগ করবেন কেন? আপনি আমাকে স্পেশাল দাওয়াত দেবেন আর আমি যাব না, এ হয়! আমি কাল সকালে অবশ্যই যাব আপনার নিজ হাতে রান্না করা সেমাই খেতে। কিন্তু তারপরেই আপনি আমার সাথে আমাদের বাসায় চলে আসবেন। কাল সারাদিন আপনি আমাদের বাসায় থাকবেন। সারাদিন আমারা অনেক মজা করব, বিকেলে বেড়াতে যাব।'

'ঠিক আছে।'

রিমা ভাইয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা ভাইয়া, আপনাদের বাসার সবাই দেশের বাড়িতে ঈদ করতে গেল। আপনি একা থেকে গেলেন কেন?'

'আসলে ঈদের পরদিন আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে সেজন্য।'

'কি কাজ?'

'একটু পারসোনাল কাজ। তোমাকে বলা যাবে না।'

'কি! আমাকে বলা যাবে না! যান আমি রাগ করলাম।'

'সেকি! রাগ করবে কেন? মানুষের পারসোনাল কাজ থাকতে পারে না? আর তাছাড়া আমি গেলাম না বলেই তো ঈদের দিন তোমার সাথে কাটাতে পারব, সারাদিন আনন্দ করতে পারব। রাগ করে না রিমা-মনি।'

'ঠিক আছে যান, রাগ করলাম না।'

তারপর ভাইয়ার সাথে রিমা অনেকক্ষণ কথা বলল। অনেক মজার মজার কথা বলল। আর ঈদের সারাটা দিন কি কি মজা করবে, কোথায় কোথায় ঘুরবে তার প্ল্যান করে নিল।

ঈদের দিন রিমা ভাইয়ার বাসায় এলো। দরজায় নক করতেই ভাইয়া দরজা খুলে দিল। ভাইয়াকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে রিমা বলল, 'ঈদ মোবারক ভাইয়া।'

ভাইয়া রিমার চেয়েও বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'ঈদ মোবারক রিমা-মনি। আসো, ভেতরে আসো।'

ভেতরে এসে সোফায় বসে রিমা বলল, 'কই ভাইয়া, আপনার সেমাই কই? তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেন।'

'নিয়ে আসছি বাবা, নিয়ে আসছি।'

ভাইয়া একটা ট্রেতে সেমাই-নুডুলস সাজিয়ে আনল। তা দেখে রিমা বলল, 'ওয়াও ভাইয়া, আপনি দেখি পাক্কা গৃহিণীর মত করে ট্রে সাজিয়ে এনেছেন। ভবিষ্যতে আপনি গৃহিণী হিসেবে বেশ উন্নতি করবেন।'

ভাইয়া রিমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলল, 'কি বললে? আমি গৃহিণী? দেখো, এই ধরনের ইয়ারকি করলে কিন্তু আমি মাইন্ড করব।'

'ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে, আর বলব না। এখন বসেন দুজনে একসাথে খাই।'

রিমা নিজ হাতে ভাইয়াকে তুলে দিল। তারপর নিজে তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করল। খেতে খেতে হঠাৎ করে রিমা দেখল ভাইয়া কেমন করে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। রিমা তাকানোর পরও ভাইয়ার দৃষ্টি পরিবর্তন হল না। রিমা বলল, 'কি হল ভাইয়া, ওভাবে কি দেখছেন?'

'কি আবার, তোমাকে দেখছি।' তারপর সেভাবেই রিমার দিকে তাকিয়ে থাকল ভাইয়া।

'আমাকে আবার নতুন করে দেখার কি আছে?'

ভাইয়া কিছু বলল না। চোখ নামিয়ে নিল। রিমাও আর কিছু বলল না। তার ভেতরটা খচখচ করতে লাগল, এই মুহূর্তে তার খুব অস্বস্তি লাগতে লাগল।

খাওয়া শেষে ভাইয়া ট্রে রান্নাঘরে রেখে এসে আবার সোফায় বসল। রিমা বলল, 'চলেন ভাইয়া, এবার আমাদের বাসায় চলেন।'

'যাব তো বটেই।' ভাইয়া একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, 'আগে একটু এন্টারটেইনমেন্ট করে নিই।'

'কি করবেন!' রিমা ভাইয়ার কথা ঠিক বুঝতে পারল না।

ভাইয়া রিমার কথার জবাব না দিয়ে নিজের সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর রিমার পাশে গিয়ে বসল। ভাইয়া রিমার থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, 'আজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তোমাকে বাসায় এনেছি। এখন তোমাকে নিয়ে আমি একটু ফূর্তি করব।'

ভাইয়ার কথার মাথা-মুন্ড রিমা কিছুই বুঝতে পারল না। হা করে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল।

ভাইয়া রিমার থুতনি থেকে গলায় হাত নামিয়ে নিল। গলা থেকে বুকে এসে হাত স্থির হল। রিমা ছিটকে সরে গেল, বলল, 'এসব আপনি কি করছেন ভাইয়া?'

ভাইয়া কোনো কথা বলল না। এগিয়ে গিয়ে রিমাকে জাপটে ধরল। রিমা তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ভাইয়া রিমাকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর আবারো জাপটে ধরল। রিমা প্রাণপণে ছাড়া পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সে চিৎকারও করতে পারল না। শুধু বুঝতে পারল তার জীবনে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে!

রিমা বাসায় ফিরে ঘরের দরজা লাগিয়ে কাঁদতে লাগল। বাসায় অনেক মেহমান, আব্বু-আম্মু তাকে লক্ষ্য করল না।

রিমা কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার প্রিয় ভাইয়া, যে ভাইয়াকে সে এত শ্রদ্ধা করে, এত ভালো লাগে যে ভাইয়াকে, সে ভাইয়া এমন কাজ করতে পারে–সেটা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঘৃণায় রিমার গা-গুলিয়ে এলো। ভাইয়ার প্রতি ঘৃণা, নিজের প্রতি ঘৃণা, আব্বু-আম্মুর প্রতি ঘৃণা, এই পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা। হঠাৎ করে রিমার শরীর কাঁপতে লাগল, কাঁপতে কাঁপতে বমি হল, তারপর জ্বর এলো, প্রচণ্ড জ্বর এলো।

সেই থেকে প্রতি ঈদেই রিমার জ্বর আসে। ব্যাপারটা মনে হলেই ঘৃণায় তার গা-গুলিয়ে আসে, বমি হয়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে, জ্বর আসে, প্রচণ্ড জ্বর আসে।

সেই দিনের পর ভাইয়ার কাছে রিমাকে আর পড়তে হয় নি। রিমা কিছু করে নি, ভাইয়া নিজেই রিমার আব্বু-আম্মুকে কি যেন চাকরির কথা বলে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছে। রিমা খুব খুশি হয়েছিল। এই জন্যে যে, রিমাকে কিছু বলতে হয় নি এবং ঐ নরপশুর মুখ আর দেখতে হয় নি বলে।

রিমা অনেকবার আম্মুকে ব্যাপারটা বলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বলতে পারে নি। তার লজ্জা লাগে, খুব ঘৃণা হয়। ভাইয়ার প্রতি ঘৃণা, ঐ নরপশুর নাম নিতেই তার ঘৃণা হয়। নিজের প্রতি ঘৃণা, ভাইয়ার টোপ কত সহজে সে গিলে ফেলেছে, এই ভাইয়াকে সে কতই না শ্রদ্ধা করেছে, কতই না বিশ্বাস করেছে। আব্বু-আম্মুর প্রতি ঘৃণা, তার অস্বাভাবিক আচরণ, বিষন্নতা কত সহজে তাদের চোখের আড়াল হয়ে গেল। এই পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা, কেন পৃথিবীতে এমন পাশবিক ঘটনা ঘটে, কেন সে এভাবে অসহায় হয়ে গেল? শেষমেষ সে কাউকেই কিছু বলে না, বলতে পারে না। নিজের ভেতরেই জমিয়ে রাখে।

রিমা তার হাঁটুর উপর হাত রেখে, হাতের উপর থুতনি রেখে এক দৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। জুলি বলল, 'কিরে রিমা, কি ভাবছিস?'

রিমা চমকে উঠল, বলল, 'উঁ!'

'তুই কি ভাবছিস?'

'কই কি ভাবছি?'

'উঁহু, লুকানোর চেষ্টা করিস না। তুই কিছু ভাবছিলি।'

রিমা কোনো কথা বলল না।

'কিরে কথা বলছিস না কেন?'

রিমা এবারও কোনো কথা বলল না।

'আচ্ছা রিমা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'কি কথা?'

'তোর জীবনে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যা তুই কাউকে বলতে পারছিস না। খুব ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা, খুব লজ্জার কোনো ঘটনা।'

রিমা একটু চমকে উঠল। কোনো কথা বলল না।

জুলি রিমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কি হল কথা বলছিস না কেন?'

রিমা দাঁত-মুখ শক্ত করে বলল, 'আমাকে বিরক্ত করিস না। প্লিজ!'

ওরা রিমাকে আর ঘাঁটাল না। নাস্তা করে চলে গেল।

রিমা মোটাসোটা কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়ল। গত ছয় বছরের প্রতি ঈদেই এরকম হয়। যে দিনে সবাই আনন্দ করে, মজা করে ঘুরে বেড়ায় সেই দিনে রিমা ঘরের কোণে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকে আর কাঁদে। সবার কাছে যে দিন খুব আনন্দের দিন, রিমার কাছে সেদিন বিষাদের দিন, পরম শূন্যতা ও অসহায়ত্বের দিন।

রিমা সবার কাছ থেকেই তার জীবনের ভয়ঙ্কর সেই ঘটনাটা এড়িয়ে যায়। অভিমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় সে কাউকেই কিছু বলতে পারে না, বলতে চায় না। সবার কাছেই সে ব্যাপারটা গোপন করে রাখে। নিজের কাছেও যদি সে ভয়ঙ্কর সেই ঘটনাটা গোপন করে রাখতে পারত!

ঘুম

ঘুম আসছে না তরিকুল সাহেবের। দুপুরে খাওয়ার পর থেকেই তাঁর কেমন যেন লাগছে, তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। প্রতি বেলা তাঁকে আট-দশটা করে ওষুধ খেতে হয়। যে সব কারণে তাঁকে ওষুধ খেতে হয় তাঁর কোনোটাই আজ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন তাঁর শরীরে যে সব রোগ বাসা বেঁধে আছে তার কোনোটাই আজ তাঁর শরীর খারাপের কারণ নয়। তাঁর শরীর অবশ্য খারাপও করছে না, কেমন কেমন যেন লাগছে, কেমন যেন অস্বস্তিকর ভাব।

অনেকক্ষণ থেকেই তিনি ঘুমানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। দুইটা হাই পাওয়ারের ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছেন তবুও ঘুম আসতে চাইছে না। অনেকদিন থেকে তাঁর শরীর খারাপ হয় নি। তিনি ডাক্তারের সব নিয়ম মেনে চলেন। সকালে দুইটার বেশি রুটি খান না, দুপুরে মেপে মেপে ভাত খান, মাছ-মাংসের চেয়ে সবজি বেশি খান, সকাল-বিকাল হাঁটাহাঁটি করেন, সময়মত বিশ্রাম নেন, হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে পড়েন না, যেখানে উত্তেজিত হওয়া প্রয়োজন সেখানেও না আর ভাজা-পোড়া বা নেশার কোনো বস্তু একেবারেই স্পর্শ করেন না। ডাক্তার যেভাবে যেভাবে বলে দিয়েছেন তিনি সবকিছু সেভাবে সেভাবে মেনে চলেন। তাঁর শরীর খারাপ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

শুধু আজ সকালে তিনি একবার উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন উত্তেজিত না হওয়ার, কিন্তু পারেন নি।

ছেলেটা আজ এসেই রেগে রেগে বলল, 'আম্মা আপনাকে আজই দিতে বলেছেন। আজ আপনাকে দিতেই হবে। না নিয়ে আজ আমি যাব না।'

তরিকুল সাহেব বললেন, 'শোনো ছেলে, আমার সাথে এভাবে রাগ দেখিয়ে কথা বলবে না। তোমার আম্মাকে যা বলার বলে দিয়েছি। তারপরও কেন তোমাকে বারবার পাঠাচ্ছেন? যাও, এখনি চলে যাও, আর কোনোদিন আসবে না।'

ছেলেটা গেল না, চোখ গরম করে তরিকুল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি চীজ, আপনি ছোটলোক, আপনি জোচ্চুরি করেছেন, আপনাকে দিতে হবে, আজই দিতে হবে। না নিয়ে আজকে আমি যাব না।'

তরিকুল সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না! একটা আট-নয় বছরের ছেলে তাঁকে ছোটলোক-জোচ্চর বলে গালি দিচ্ছে, শাসাচ্ছে! তিনি রেগে যেতে গিয়েও রাগলেন না, বললেন, 'তুমি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছো ছেলে। এখনি এখান থেকে চলে যাও, আর কোনোদিন এখানে আসবে না।'

ছেলেটা এবারও চলে যাবার লক্ষণ দেখাল না, উল্টো মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'না গেলে কি করবেন? না নিয়ে আজকে আমি এখান থেকে যাব না। দেখি আপনি কি করতে পারেন!'

তরিকুল সাহেব আর পারলেন না, রেগে গিয়ে চটাশ চটাশ করে ছেলেটার গালে দুইটা চড় মেরে দিলেন, তারপর ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে পিয়নকে ডাকলেন, 'রহিম, একে বাইরে ফেলে দাও।'

রহিম নামের পিয়নটা যখন ছেলেটাকে তুলে টেনে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ছেলেটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'শালা চীজ, তুই জোচ্চুরি করেছিস। দে, আজই তোকে দিতে হবে। না নিয়ে আমি যাব না'।

তরিকুল সাহেবের মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি আবার গালি সহ্য করতে পারেন না। তিনি অন্যকে অবলীলায় বাপ-মা তুলে পর্যন্ত গালি দিয়ে দেন, কিন্তু তাঁকে কেউ গালি

দিলে তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। তিনি চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ছেলেটার পেটে একটা লাথি বসিয়ে দিলেন। ছেলেটা পিয়নের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে তিন-চার হাত দূরে পড়ে কোঁকাতে লাগল। তবুও তরিকুল সাহেবের রক্ত ঠাণ্ডা হল না। তিনি দুম দুম করে ধাপ ফেলে ছেলেটার পাশে গিয়ে তার পেটের উপর আবার একটা লাথি বসিয়ে দিলেন। ছেলেটা এবার কোঁকাতে কোঁকাতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

তরিকুল সাহেব খেকিয়ে উঠে বললেন, 'তোর কত্ত বড় সাহস, তুই আমাকে গালি দিস! বেজন্মার বাচ্চা–' বলেই আবার ছেলেটার কোমড়ে একটা লাথি বসিয়ে দিলেন। ছেলেটা আবার কোঁকাতে কোঁকাতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

পিয়নসহ আরো দুই-তিনজন মিলে তরিকুল সাহেবকে শান্ত করার চেষ্টা করল। তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তিনি তখন বেশ হাঁপাচ্ছিলেন। ওষুধ খেলেন, পানি খেলেন তারপর শান্ত হলেন।

পিয়ন এসে ছেলেটাকে যখন টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে বলল, 'তুই বাঁচবি না, তুই মরবি!'

বলতে বলতে ছেলেটা কাশতে লাগল, কাশতে কাশতে সে বমি করে ফেলল। তারপরও তাকে অফিসের বাইরে নিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পিয়ন।

অফিসের বাইরে ছেলেটা বেশ কিছুক্ষণ পড়ে ছিল। পরে এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক তাকে বাড়িতে দিয়ে এসেছে। ছেলেটা অবশ্য বাড়ি যেতে চাইছিল না। সে আবার অফিসের ভেতরে ঢুকতে চাইছিল কিন্তু দারোয়ান তাকে ঢুকতে দেয় নি, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। শেষমেষ সে বাড়ি ফিরে গেল।

তরিকুল সাহেব ব্যালকুনিতে পায়চারি করছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না, কেন তাঁর ঘুম আসছে না। তাঁর হাইপ্রেসার ছিল, ইদানিং সেটা স্বাভাবিক আছে। আজ অফিস থেকে ফেরার সময় একবার প্রেসার মেপে এসেছেন, সেটা ঠিকই আছে। তাঁর হার্টের সমস্যা আছে, কিন্তু সেটাও আজ সমস্যা করছে না। হার্টের সমস্যা হলে যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তার কোনোটাই এখনো দেখা যায় নি। তাঁর ডায়বেটিসের সমস্যা আছে, এটাও আজ সমস্যা করছে না। তাঁর গ্যাস্ট্রিক আছে, হজমে সমস্যা হয়–এগুলোও আজ সমস্যা করছে না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? তাঁর এরকম লাগছে কেন? তিনি বুঝতে পারছেন না।

তরিকুল সাহেবের তাঁর স্ত্রীর উপর খুব হিংসা হচ্ছে। এই মহিলা নাকের বাঁশি বাজিয়ে খুব মজা করে ঘুমাচ্ছে, অথচ তাঁর চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও ঘুম আসছে না দেখে তিনি ব্যালকুনিতে পায়চারি করছেন। তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না–তাঁর পেট ব্যথা নেই, বুক ব্যথা নেই, মাথা ব্যথা নেই, ঘাড় ব্যথা নেই, শরীরের কোন জায়গায়-ই ব্যথা নেই, তিনি ঘামছেন না, ঘন ঘন ক্ষুধা পাচ্ছে না, তেষ্টা পাচ্ছে না তবুও কেন তাঁর এরকম লাগছে!

তরিকুল সাহেব ব্যালকুনির গ্রিলে হাত রেখে দাঁড়ালেন, তাকালেন আকাশের দিকে–চাঁদ তারা কিছু নেই। আজ অমাবস্যা কিনা তরিকুল সাহেব বুঝতে পারলেন না–তিনি এসব বোঝেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি নিজের স্মৃতির মাঝে ডুব দিলেন। আজ সারাদিন তিনি কি করেছেন তা একবার দেখে নিতে চাইলেন। আর তখনই তাঁর মনের পর্দায় একটা মুখ ভেসে উঠল, একটা মাসুম বাচ্চা ছেলের মুখ!

তরিকুল সাহেব ব্যালকুনিতে রাখা তাঁর আয়েশী চেয়ারে বসে পড়লেন। ছেলেটার কথা তাঁর মনে পড়ছে। ছেলেটার নাম–অন্তু। মাঝে মাঝেই সে তাঁর কাছে আসে। তাঁর কাছে ছেলেটার একটা বিশেষ পাওনা আছে, কিন্তু তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। ছেলেটা পাওনা বুঝে নিতে আসে আর তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। মাঝে মাঝে আজকের মত লাথি-গুঁতো দিয়ে বের করে দেন। তবুও ছেলেটা আসে তার পাওনা বুঝে নিতে।

ছেলেটা আজ একটু বেশি খেপে গিয়েছিল। তরিকুল সাহেবও একটু বেশিই খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছেন ছেলেটার সাথে। ছেলেটার বাবা নেই। এতিম একটা ছেলেকে তিনি ওভাবে লাথি মেরেছেন, এটা ভেবে তাঁর এই মুহূর্তে খুব খারাপ লাগছে। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুতে গেলেন। এসব ব্যাপারে তাঁর খুব একটা অনুশোচনা হয় না। তাঁর মতে মানুষের জন্য অনশোচনা মানায় না। তবুও কেন জানি মাঝে মাঝে তাঁর মনে অনুশোচনা ভীড় করে। তিনি তা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন। আজও তাঁর মনে অনুশোচনা ভীড় করতে চাইছিল, তিনি তাকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

অন্তর বাবা মারা গেছেন দুই বছর আগে। একটা হাই স্কুলে কেরানির চাকরি করতেন তিনি। মারা যাবার সময় তিনি তেমন কিছু রেখে যেতে পারেন নি। শুধু তিন কাঠার একটা জমি রেখে গিয়েছেন। অন্তদের নিজের বাড়িও নেই। তাই তাদের ভাড়া বাসায় থাকতে হয়। অন্তর বাবা মারা যাবার পর তার আম্মা অনেক চেষ্টা–তদবির করে পেনশনের যে টাকা পাচ্ছিলেন তা খুবই কম। এই টাকা দিয়ে ভাড়া বাসায় থেকে সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না, হোক তা মাত্র দুইজনের সংসার। তখন অন্তর আম্মা ঠিক করলেন তাদের সেই জায়গাতে বেড়া-টিন দিয়ে হলেও একটা ঘর তুলবেন। তারপর সেখানে থাকবেন। অন্তত ভাড়ার টাকাটা তো বাঁচানো যাবে। কিন্তু তাঁর সে চাওয়া পূরণ হল না। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন সেই জমি কারা যেন দখল করে নিয়েছে।

তাঁদের তেমন কোনো আত্নীয়স্বজন নেই। যারা আছে তাদের সাথে আবার যোগাযোগ নেই। দখল হওয়া জমি উদ্ধারের জন্য যখন অন্তর আম্মা দিশেহারা অবস্থায় আছেন তখন একদিন তরিকুল সাহেব তাঁদের বাসায় এলেন।

তরিকুল সাহেব দরজায় নক করতেই অন্ত চেঁচিয়ে বলল, 'কে?'

'আমি আব্বু, দরজাটা একটু খোলো।' তরিকুল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন।

ভেতর থেকে অন্ত আবার চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি কে?'

'আমি তোমার আব্বুর বন্ধু, তরিকুল।'

'আপনি কি চান?'

'তোমার আম্মুর সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অন্ত আবার চেঁচিয়ে বলল, 'কি কথা বলতে চান?'

তরিকুল সাহেব ভেতরে ভেতরে খুব অপমানিত বোধ করলেন। বাইরে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে! তাঁর একটু রাগও হল। কিন্তু তিনি রাগলেন না। আগের চেয়েও গদগদ গলায় বললেন, 'তোমাদের যে জমিটা দখল হয়েছে, সেই জমিটার ব্যাপারে তোমার আম্মার সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

আবারও কিছুক্ষণের নিরবতা। তারপর অন্ত দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকেই তরিকুল সাহেব সালাম দিয়ে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম ভাবি, কেমন আছেন?'

এতক্ষণ অন্ত তার আম্মার শিখিয়ে দেওয়া কথা বলতে বলতে মোটামুটি অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। তাই তরিকুল সাহেবের সালামের উত্তর সে নিজেই দিল, বলল, 'অলাইকুম আস্সালাম। আমরা ভালো আছি।'

তরিকুল সাহেব খিক খিক করে হেসে উঠলেন, গদগদ গলায় বললেন, 'কি জিনিয়াস ছেলে! এসো বাবা কাছে এসো। কি নাম তোমার আব্বু?'

'অন্ত।'

তরিকুল সাহেব অন্তর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন, তার হাতে এক প্যাকেট চকলেট ধরিয়ে দিলেন। তারপর অন্তর আম্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব বুদ্ধিমান ছেলে আপনার।'

অন্তর আম্মা ঘরের এক কোণে বড়সড় একটা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'আপনি বসেন।'

অন্ত একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। এরই মধ্যে সে দুইটা চকলেট একসাথে মুখে ভরে দিয়েছে। তরিকুল সাহেব অন্তকে কোলে নিয়ে চেয়ারে বসলেন। তারপর অন্তর আম্মাকে বললেন, 'আপনিও বসুন না ভাবি।'

অন্তর আম্মা দূরেই একটা মোড়া নিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'অন্তর আব্বু আপনার কেমন বন্ধু ছিল? আপনাকে তো কোনোদিন দেখি নি।'

'সোবহান ভাইয়ের সাথে আমর খুব ভালো খাতির ছিল। আপনি সম্ভবত আমাকে আগে দেখেন নি। সোবহান ভাই অনেকদিন বলেছেন বাসায় আসতে কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি। তবে উনার সাথে আমার প্রায়ই দেখা হত, কথা হত। খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমাদের। খুব ভালো মানুষ ছিল সোবহান ভাই।' তরিকুল সাহেব একেবারে গদগদ হয়ে কথাগুলো বললেন এবং হাত দিয়ে চোখ মুছে বোঝাতে চাইলেন তিনি অন্তর আব্বুকে মনে করে কাঁদছেন। তারপর অন্তর আব্বুর নামে অনেক ভালো ভালো কথা বলতে লাগলেন। তিনি কত ভালো মানুষ ছিলেন তরিকুল সাহেব পারলে মেপে দেখান! তিনি মারা যাওয়ায় এই পৃথিবীর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে লম্বা একটা বক্তৃতা দিয়ে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

তরিকুল সাহেব বেশ কিছুক্ষণ অন্তর আব্বুর গুণকীর্তন করে বললেন, 'শুনলাম, সোবহান সাহেবের যে তিন কাঠার জমিটা আছে, সেটা নাকি দখল করে নিয়েছে?'

অন্তর আম্মা হু হু করে কেঁদে ফেললেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না। তরিকুল সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি কাঁদবেন না ভাবি। ঐ জমি যেভাবে হোক ছাড়িয়ে আনবো। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

তারপরও অন্তর আম্মা কাঁদছেন দেখে তিনি বললেন, 'আহা ভাবি, আপনি কাঁদবেন না। আপনি আমাকে নিজের ভাই মনে করতে পারেন। ঐ জমি ছাড়িয়ে আনার জন্য আমি যতটুকু পারি করব। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

অন্তর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তাকে বললেন, 'আব্বু তুমি ঠিক মত খাওয়া-দাওয়া করছো তো?'

'জ্বি।' খুব মজা করে চকলেট খেতে খেতে অন্ত উত্তর দিল। এটা ওর আম্মার শিখিয়ে দেয়া, যাতে কেউ ওদের করুণা দেখাতে না পারে।

'তোমার কোনো সমস্যা হলে তুমি আমাকে বলবে। যখন যা লাগবে আমাকে গিয়ে বলবে। আমি তোমাকে আমার বাসা চিনিয়ে দেব।' অন্তকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন তরিকুল সাহেব।

'আচ্ছা ভাবি, জমিটার কোনো দলিল-টলিল আছে আপনার কাছে?' অন্তর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তার আম্মাকে বললেন তরিকুল সাহেব।

'না। আমাকে কোনো দলিল-টলিল দিয়ে যায় নি।' মাথা নিচু করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন অন্তর আম্মা।

'ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। দেখি কি করা যায়।' তারপর আবার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ভাবি, আমি আমার সাধ্য মত চেষ্টা করব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্তর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আচ্ছা ভাবি, আপনাদের এখন চলছে কিভাবে?'

'অন্তর আব্বুর পেনশনের টাকা দিয়ে।'

'ও।' তিনি একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন কত টাকা পান, কিন্তু ব্যাপারটা অভদ্রতা হয়ে যাবে দেখে আর জিজ্ঞেস করলেন না।

'ভাবি, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনি আমার কাছে কোনো সংকোচ করবেন না। আপনার যে কোনো সমস্যায় আমাকে বলবেন। আপনাদের আপদে-বিপদে পাশে

থাকতে দিয়ে আমাকে ধন্য হওয়ার সুযোগ দেবেন। সোবহান ভাইয়ের মত মানুষের পরিবারের একটু উপকার করতে পারাও সৌভাগ্যের।' তরিকুল সাহেব একটু কাঁদো কাঁদো ভাবে বললেন।

'আর ঐ জমির ব্যাপারে আপনি কোনো চিন্তাই করবেন না। ঐ জমির কথা আপনি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। ওটা আমি দেখব।'

অন্তর আম্মা কোনো কথা বললেন না। এভাবে অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলার অভ্যাস তাঁর নেই। তিনি যে তরিকুল সাহেবকে বিশ্বাস করে ফেলেছেন তা নয়। অন্তর আব্বু মারা যাবার পর থেকে তিনি এ ধরনের পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে আসছেন। তিনি কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না, আবার ফিরিয়েও দেন না। ভাবেন, এর মধ্যে কেউ যদি তাঁর সত্যিই উপকার করে, সত্যিই যদি কেউ তাঁদের আপন করে নেয়!

তরিকুল সাহেব একটু চা-নাস্তার আশা করেছিলেন। দিশেহারা এই পরিবার তাঁকে যে তেমন আপ্যায়ন করতে পারবে না সেটা তিনি জানতেনই। তবুও তিনি অন্তত চা-বিস্কিটের আশা করেছিলেন। সেই আশা পূরণ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ভাবি, তাহলে আজ আমি আসি। একটু ভালোভাবে দেখেশুনে থাকবেন। আমি কয়েকদিনের মধ্যে আবার আসবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনার এ ভাই থাকতে আপনি ভিটেহারা হবেন না। ইনশাল্লাহ্।'

অন্ত খুব মজা করে চকলেট খাচ্ছে। তার চকলেট খাওয়ায় ডিস্টার্ব হবে জেনেও তরিকুল সাহেব অন্তর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আব্বু, আমি তাহলে এখন আসি। তুমি কিন্তু একদম দুষ্টুমি করবে না, মন দিয়ে পড়াশোনা করবে, আম্মার কথা শুনবে, কেমন?'

অন্ত মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল।

তরিকুল সাহেব অন্তর আম্মাকে সালাম দিলেন। অন্তর আম্মা সালামের উত্তর দেয়ার আগেই অন্ত উত্তর দিয়ে দিল। তরিকুল সাহেব সেটা শুনে খিক খিক করে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

দুইদিন পর সাত-সকালে তরিকুল সাহেব অন্তদের বাসায় হাজির। সাথে বিরাট বাজার সদাই। তাঁর কাণ্ড দেখে অন্তর আম্মা হা হা করে উঠলেন, 'একি! এসব আপনি কি করেছেন! এতসব আনতে গেছেন কেন!'

'খুব সাধ হল ভাবি, এই মাসুম বাচ্চার সাথে বসে একটু ভালো-মন্দ খাবো। আর সোবহান ভাইয়ের কাছে শুনেছি আপনি খুব ভালো রাঁধেন। তাই নিয়ে চলে এলাম।'

অন্তর আম্মা ফিরিয়ে দিতে চাইছিলেন কিন্তু এরই মধ্যে অন্ত মস্ত বড় রুই মাছটা হাতে নিয়ে বলল, 'আম্মা দেখছো, কত্ত বড় মাছ!' তারপর উঁ উঁ করে লাফাতে লাফাতে বলল, 'আমি কিন্তু মাছের মাথাটা খাব।'

'অবশ্যই খাবে। তোমার জন্যই তো আমি এগুলো এনেছি।' তরিকুল সাহেব অন্তকে কাছে টেনে নিলেন। তারপর অন্তর আম্মাকে বললেন, 'যান ভাবি, এগুলো নিয়ে যান। খুব ভালো করে পাক করবেন। আরো যদি কিছু লাগে আমাকে বলবেন।'

অন্তর আম্মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেগুলো ভেতরে নিয়ে গেলেন। তরিকুল সাহেব অফিসে চলে গেলেন। দুপুরে এসে তিনি খাবেন। রান্না করতে গিয়ে অন্তর আম্মা যে পরিমাণ কেঁদেছেন তাতে রান্নার জন্য আলাদা পানির প্রয়োজন ছিল না, তাঁর চোখের পানিতেই হয়ে যেত!

দুপুরে অন্ত আর তরিকুল সাহেব খুব মজা করে খেলেন। অন্তর খাওয়া দেখে আম্মা কেঁদে ফেললেন। অনেকদিন ধরে এই মাসুম বাচ্চাটাকে তিনি ভালো কিছু খাওয়াতে পারেন নি। এই মুহূর্তে তিনি তরিকুল সাহেবকে খুব বিশ্বাস করে ফেললেন। ভাবলেন, এই মানুষটাই তাঁর দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন।

কয়েকদিন পর তরিকুল সাহেব অফিস শেষ করে এলেন অন্তদের বাসায়। এসে বসার পর হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'ভাবি, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না।'

'মনে করার কি আছে? আপনি বলেন।'

'মানে আসলে, জমির দখলদার বেশ মালদার পার্টি। খুব ঝামেলা হচ্ছে। আর আমিও ছোট চাকরি করি, তারপরও অবশ্য বেশ কিছু খরচা-পাতি করে ফেলেছি। আপনিও যদি কিছু টাকা ম্যানেজ করতে পারতেন–তাহলে কাজটা একটু সহজ হতো আর কি।'

'আমার কাছে তো এখন কোনো টাকা-পয়সা নাই। আপনি কালকে একটু কষ্ট করে আসেন, আমি চেষ্টা করি।'

'আপনি আবার কিছু মনে করবেন না ভাবি যে এভাবে টাকা চাইছি। আসলে–'

তরিকুল সাহেবকে বাঁধা দিয়ে অন্তর আম্মা বললেন, 'আপনি ওভাবে বলছেন কেন ভাই। আমি নিজেও তো একটু এ ব্যাপারে ঘোরাঘুরি করেছি, আমি জানি আপনার কত ঝামেলা হচ্ছে। আপনি এভাবে আমার কাছে সংকোচ করবেন না। আমি আমার সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করব।'

তরিকুল সাহেব অন্তর আম্মার কথা শুনে খুব খুশি হলেন। তারপরও গদগদ হয়ে বললেন, 'আমার অবস্থা যদি আরেকটু ভালো হতো তাহলে আর আপনার কাছে টাকা চাইতাম না।'

'ছি!ছি! আপনি এসব কি বলছেন! এভাবে বললে কিন্তু আমি খুব দুঃখ পাবো।'

'না, না, ঠিক আছে। আপনার দুঃখ পাবার কোনো দরকার নাই। আমি আর এসব বলব না। আপনি আমাকে মাফ করে দেবেন।'

অন্তর আম্মা বললেন, 'তাও কত টাকা হলে ভালো হয় ভাই।'

'এই হাজার তিন-চারেক হলে ভালো হয়। তবে, আপনি যা পারেন–বেশি হলে ভালো, কম হলে আমি ম্যানেজ করে নেব।' তরিকুল সাহেব তাঁর হাত কচলাতে লাগলেন।

'ঠিক আছে, আপনি একটু কষ্ট করে কালকে একবার আসেন। দেখি কতটুকু কি করতে পারি।'

'কষ্ট আর কি? আমি তো রোজই আসতে চাই কিন্তু সময় হয় না। অফিস শেষ করেই এটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করি।'

তরিকুল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলে আসি ভাবি। আপনি আবার বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না, একেবারে নিশ্চিন্তে থাকবেন, আপনার হাতে আমি জমি তুলে দিবই।'

'ঠিক আছে ভাই, আপনার প্রতি আমার সে বিশ্বাস আছে।'

অন্তর আম্মার উচিত ছিল তরিকুল সাহেবকে রাতে খেয়ে যেতে বলা। কিন্তু তিনি যা রেঁধেছেন তাতে তরিকুল সাহেবকে খাওয়ার কথা বলতে পারলেন না, ভদ্রতা করেও না। তরিকুল সাহেব অন্তকে আদর করে চলে গেলেন।

পরদিন তরিকুল সাহেবের হাতে অন্তর আম্মা সাড়ে তিন হাজার টাকা তুলে দিলেন। অগাধ বিশ্বাসে তিনি টাকাটা দিলেন। তরিকুল সাহেব গদগদ হয়ে টাকাটা নিলেন। তারপর আবার নিশ্চিন্তে থাকার আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন।

এর কয়েকদিন পর অফিস শেষে তরিকুল সাহেব আবার অন্তদের বাসায় এলেন। তারপর হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'ভাবি, কি বলব, জমিটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিলাম কিন্তু এর মধ্যে আবার ঝামেলা পেকে গেছে। বুঝতেই পারছেন দখলদার বেশ মালদার পার্টি।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি আমার এ মাসের অগ্রিম বেতন তুলে ফেলছি। আপনিও যদি কিছু ম্যানেজ করতে পারেন তাহলে হাতটা আরেকটু শক্ত হতো।'

'জমিটা উদ্ধার হবে তো ভাই। আমি তো আমার প্রায় সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছি।' কিছুটা আকুতির ভঙ্গিতে বললেন অন্তর আম্মা।

'আপনি আমার উপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারেন ভাবি। আমি জমিটা উদ্ধার করেই ছাড়বো।' তরিকুল সাহেব বেশ জোড় দিয়ে বললেন।

তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি ছোট চাকরি করি, টানাটানির সংসার। তা না হলে আপনার কাছে আমি টাকা চাইতাম না ভাবি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'ছি! ছি! আপনি বারবার কেন এমন করে কথা বলেন? আপনি যা করেছেন তার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না।' ফোঁপাতে লাগলেন অন্তর আম্মা।

তরিকুল সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। পরদিন টাকার ব্যবস্থা করে রাখতে বলে তিনি চলে এলেন।

পরদিন অফিস শেষে গেলেন অন্তদের বাসায়। অন্তর আম্মা আড়াই হাজার টাকা নিশ্চিন্তে তরিকুল সাহেবের হাতে তুলে দিলেন।

কয়েকদিন পর তরিকুল সাহেব যখন এলেন তখন অন্তর আম্মা ভেবেছিলেন কোনো সুসংবাদ পাবেন। কিন্তু তরিকুল সাহেবের মুখ দেখে তাঁর আশার গুড়ে বালি পড়ে গেল।

তরিকুল সাহেব ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না, মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। তারপর কিছুটা ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'আমার খুব লজ্জা লাগছে ভাবি, কি করে যে বলি!'

অন্তর আম্মা কোনো কথা বললেন না। তরিকুল সাহেব কি বলতে চান তা শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকলেন।

'আসলে ভাবি আরো কিছু টাকা লাগবে।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন তরিকুল সাহেব।

অন্তর আম্মার বুক ধক করে উঠল। তাঁর পক্ষে এখন আর টাকা দেয়া সম্ভব নয়। তাঁর এই মুহূর্তে শেষ সম্বল অন্তর আব্বুর পেনশনের যে টাকাটা মাসে মাসে পান সেটা। তিনি ঘরের বেশ কিছু জিনিসপত্র এবং তাঁর সামান্য কিছু গহনা বিক্রি করে দুইবারে মোট ছয় হাজার টাকা দিয়েছেন। বিক্রি করে তরিকুল সাহেবকে টাকা দেয়ার মত ঘরে এখন শুধু তিনি আর অন্তই আছেন। আর কিছু নেই।

অন্তর আম্মা মাথা নিচু করে কাতর গলায় বললেন, 'আমার পক্ষে আর টাকা জোগাড় করা সম্ভব না ভাই।'

'ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়।' মুখটা একটু বিকৃতি করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন তরিকুল সাহেব।

'তাহলে কি জমিটা ছাড়ানো যাবে না?' একটু বেশি কাতর গলায় বললেন অন্তর আম্মা।

'এখনি সেরকম ভাববেন না। আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করব।' আগের মত জোর দিয়ে আর বললেন না তরিকুল সাহেব।

এরপর তরিকুল সাহেব আর আসেন নি অন্তদের বাসায়। অনেকদিন হয়ে গেল তরিকুল সাহেব আসেন না দেখে অন্তর আম্মা চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁর ভয় হতে লাগল, লোকটা কি তবে তাঁর সাথে প্রতারণা করলেন! তিনি এও ভাবলেন, বোধ হয় কোনো ঝামেলা হয়েছে নয়তো তিনি খুব ব্যস্ত। তরিকুল সাহেবের সাথে যে যোগাযোগ করবেন সে উপায়ও নেই। তিনি কোথায় চাকরি করেন, বাসা কোথায় কিছুই জানতে চাওয়া হয় নি কোনোদিন।

অন্তর আম্মার ভয় বাড়তে লাগল। মাস পার হয়ে গেল তরিকুল সাহেবের আর দেখা নেই। অন্তর আম্মা রোজ সকালে উঠে ভাবেন, আজ মনে হয় আসবেন। কিন্তু তরিকুল সাহেব আসেন না। রোজ রাতে তিনি কাঁদেন, কিন্তু তাঁর কান্না কেউ দেখে না। তিনি অসহায় হয়ে শুধু অপেক্ষা করেন, তরিকুল সাহেব আসেন না।

এভাবে যখন আরো এক মাস পার হয়ে গেল তখন অন্তর আম্মা অন্তকে নিয়ে তরিকুল সাহেবকে খোঁজ করা শুরু করলেন। প্রথমে তিনি তাঁর বাড়িওয়ালার কাছে গেলেন। তরিকুল সাহেব যখন তাঁর কাছে এসেছেন তখন নিশ্চয় বাড়িওয়ালা দেখে থাকবেন। বাড়িওয়ালা মানুষটা খুব একটা ভালো না। কথায় কথায় তিনি অন্তর আম্মাকে বলেন, 'ভাড়া

দিতে না পারলে কইলাম পাছায় লাথি দিয়া বাড়ি থাইকা বাইর কইরা দিমু। কোনো কাকুতি-মিনতি শুনতে পারুম না।'

বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'ঐ মানুষরে চিনব না! ঐটার মত চীজ, বাটপার, জোচ্চর, ঠকবাজ, লুচ্চা দুনিয়ায় আর আছে একটা!'

'আপনি আমাকে আগে বলেন নি কেন!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন অন্তর আম্মা।

বাড়িওয়ালা মুখ বিকৃতি করে বললেন, 'আপনার খুব পিরিত করার সখ হইছিল, আমি বলার কে?'

অন্তর আম্মা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত বাজে কথা তিনি আশা করেন নি এই বাজে লোকটার কাছ থেকে। তিনি আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। শুধু তরিকুল সাহেব কোথায় চাকরি করেন সেটা জেনে চলে এলেন। বাড়িওয়ালা অবশ্য বলতে চাইছিলেন না, অন্তর আম্মা কেঁদে-কেটে একাকার হয়ে গেলে তারপর বলেছেন।

তখনই অন্তর আম্মা অন্তকে নিয়ে হাজির হলেন তরিকুল সাহেবের অফিসে। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতেই সে তরিকুল সাহেবের টেবিল দেখিয়ে দিল। অন্তর আম্মা আর অন্ত তরিকুল সাহেবের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের দেখে তরিকুল সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। তিনি এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন যেন এতক্ষণ তিনি আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এইমাত্র টুপ করে পড়ে গেলেন, এখন তিনি কোথায় আছেন কিছু বুঝতে পারছেন না।

অন্ত তরিকুল সাহেবের কাছে গিয়ে বলল, 'আঙ্কেল, আপনি অনেকদিন ধরে আমাদের বাসায় যান না কেন?'

তরিকুল সাহেব কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আরে ভাবি আপনারা! আমি তো কল্পনাও করতে পারি নি আপনি আসবেন! বসেন ভাবি বসেন।'

তারপর গদগদ হয়ে অন্তকে বললেন, 'তুমি কি যেন বলছিলে আব্বু?'

অন্ত ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'আপনি অনেকদিন ধরে আমাদের বাসায় যান না কেন?'

'আসলে হয়েছে কি আব্বু, আমার না অ-নে-ক কাজ। এই জন্য এতদিন যেতে পারি নি।' তরিকুল সাহেব প্রয়োজনের চেয়েও বেশি গদগদ হয়ে বললেন।

তরিকুল সাহেব আরো গদগদ হয়ে অন্তকে বললেন, 'আব্বু তুমি কি খাবে? কলিজার সিঙ্গারা খাবে?'

'না।' কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল অন্ত।

'কেন?'

'আম্মা নিষেধ করেছে।'

অন্তর আম্মার মাথায় রক্ত উঠে গেল! বাসায় গিয়ে অন্তকে না পেটানো পর্যন্ত তাঁর মাথা থেকে রক্ত নামবে না।

তরিকুল সাহেব মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'না, না, এটা ঠিক না। এভাবে বাচ্চাদের নিষেধ করা মোটেও ঠিক না।'

পিয়নকে ডেকে তিনি গরম গরম কলিজার সিঙ্গারা আর চা আনতে বললেন।

তারপর অন্তর আম্মাকে বললেন, 'তা ভাবি, কেমন আছেন বলুন?'

'ভালো আর থাকি কেমন করে?' কাতর গলায় বললেন অন্তর আম্মা, 'জমিটার খবর কি ভাই?'

'আসলে ভাবি এটাতো অফিস, এখানে এসব নিয় কথা না বলাই ভালো। আমি আজ সন্ধ্যায় আপনার বাসায় আসব। তারপর আপনার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব।'

'এতদিন আপনার দেখা না পেয়ে আমি তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আসলে অফিসের কাজে আমি অনেকদিন বাইরে ছিলাম। আপনাদের জানিয়ে যাব সে সময়ও পাই নি। আর ফিরে এসেও এত ব্যস্ত ছিলাম যে, আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি নি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আজকে আমি যাব।'

অন্তর আম্মা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলেন তরিকুল সাহেব মিথ্যে বলছেন। তারপরও কিছু বললেন না। কলিজার সিঙ্গারা আর চা খেয়ে বাসায় ফিরে এলেন। বাসায় এসে তিনি অন্তকে পেটানোর কথা ভুলে গেলেন সন্ধ্যায় এসে তরিকুল সাহেব কি বলবেন সে দুশ্চিন্তায়।

সন্ধ্যায় তরিকুল সাহেব এলেন। চেয়ারে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাত কচলানোর পর বললেন, 'আসলে ভাবি, কি করে যে বলি!'

কিছুক্ষণ থামলেন, তারপর বললেন, 'বেশ কিছুদিন বাইরে থাকায় জমিটা আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব না।'

ধক করে উঠল অন্তর আম্মার বুক। জমিটা তাহলে হাত ছাড়া হয়ে গেল! এখন তিনি কি করবেন! ভাড়া বাড়িতে থেকে ঐ কয়টা পেনশনের টাকা দিয়ে তিনি আর কতদিন চলবেন! কিভাবে অন্তকে মানুষ করবেন!

'তাহলে আর কোনো উপায় নেই?' একেবারে কাতর গলায় বললেন অন্তর আম্মা। এতটা কাতর যে, যে কারো বুক কেঁপে উঠবে।

'অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব না।' তরিকুল সাহেব সরাসরি কথাটা বললেন, কোনো রকম গদগদ ভাব দেখালেন না।

'আমার জমিতে আমি থাকতে পারব না, এটা কোন ধরনের নিয়ম ভাই?' এবার আরো কাতর হয়ে বললেন অন্তর আম্মা।

'আমি কি বলব ভাবি? আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগছে যে আমি আপনাদের কোনো উপকার করতে পারলাম না।' তরিকুল সাহেব এবার কিছুটা গদগদ হয়ে বললেন। তিনি হাত দিয়ে চোখ মুছে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি কাঁদছেন!

অন্তর আম্মা ভাবলেন ছয় হাজার টাকার কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা। ঠিক হোক বা না হোক তাঁকে বলতে হবে। এই ছয় হাজার টাকা হলেও তিনি কিছু একটা করতে পারবেন।

তরিকুল সাহেবের মত হাত কচলাতে কচলাতে তিনি বললেন, 'একটা কথা বলি ভাই?'

'বলেন ভাবি, বলেন।'

'কাজ যখন হল না, ছয় হাজার টাকাটা যদি ফেরত দিতেন তাহলে–'

'এটা আপনি কি বলছেন ভাবি!' অন্তর আম্মাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তরিকুল সাহেব কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'শুধু আপনি টাকা খরচ করেছেন, আমি করি নাই? আমার ছোট চাকরি, টানাটানির সংসার, তার মধ্যেও আমি টাকা খরচ করেছি। আপনার চেয়েও বেশি করেছি, আমাকে টাকা দেবে কে? আপনি দেবেন?'

একটু দম নিলেন তরিকুল সাহেব, তারপর বললেন, 'এখন কাজ হয় নি বলে টাকাটা ফেরত চাইছেন। যদি কাজ হত, জমিটা যদি ফেরত পেতেন তাহলে কি আমাকে সে জমিতে থাকতে দিতেন?'

একটু থেমে হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, 'দিতেন না। তখন কিছু মনেই রাখতেন না। এটাই আপনাদের মত মানুষের স্বভাব।'

অন্তর আম্মা এই রকম ব্যবহার আশা করেন নি। তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে চেপে চেপে কাঁদতে লাগলেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তরিকুল সাহেব, কয়েকবার বড় বড় শ্বাস নিলেন, তারপর কিছুটা নরম গলায় বললেন, 'আর তাছাড়া, টাকাটা তো আমি ধার বা পারিশ্রমিক হিসেবে নেই নি। কাজের জন্য নিয়েছি। আপনার কাজের জন্যই, আমার কাজের জন্য না।'

তরিকুল সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তাহলে আসি ভাবি। আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না।'

অন্তর আম্মা কোনো কথা বললেন না। তরিকুল সাহেব চলে গেলেন। বাড়িওয়ালার কথা যদি সত্যি হয় তবে তিনি যা বলে গেলেন সব মিথ্যে, এতদিন যা বলেছেন সে সবও মিথ্যে। তরিকুল সাহেব তাঁর সাথে প্রতারণা করেছেন, তাঁকে বোকা বানিয়েছেন, তাঁর সরলতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু অন্তর আম্মার কিছু করার নেই। তাঁর পাশে যে কেউ নেই! যারা আছে তারা কিছু দেয়ার জন্য নেই, আছে নেয়ার জন্য! তিনি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন। অন্ত হা করে তাকিয়ে দেখছে।

জমি গেল, ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে জোগাড় করা ছয় হাজার টাকাও গেল। বাকি রইল মাসে মাসে পাওয়া পেনশনের কয়টা টাকা। এটাও যে কেউ ছিনিয়ে নেবে না সেটা কে বলতে পারবে! সব মিলিয়ে ভাড়া বাসায় থেকে এখন তিনি কেমন করে চলবেন, কিভাবে অন্তকে মানুষ করবেন ভাবতে গিয়ে তাঁর মাথা খারাপ হওয়ার মত অবস্থা হল। তিনি একবার মামলা করার কথা ভাবছিলেন। মামলা-মোকোদ্দমায় যে তিনি পেরে উঠবেন না সেটা ভালো করেই জানেন। তাই সে ভাবনা বাদ দিলেন।

এর কয়েকদিন পরেই আরেকটা ঝড় বয়ে গেল অন্তর আম্মার উপর দিয়ে। তরিকুল সাহেবের আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়িওয়ালা অন্তর আম্মার নামে এলাকায় কুৎসা রটিয়ে দিলেন। বিচারও বসালেন এক সন্ধ্যায়। এলাকার লোকজনের সামনে তাঁকে অপমান ও বেত্রাঘাত করা হল। তারপর বাড়ি থেকে বের করে দিলেন অন্তদেরকে।

অন্তকে নিয়ে আম্মা দুইদিন রাস্তায় কাটিয়েছেন। তারপর এলাকা থেকে বেশ দূরে একটা বস্তিতে ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন। এই ঘটনায় অন্তর আম্মা এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে তিনি ঠিকমত কথা বলতে পারছিলেন না। একবার তাঁর মনে হচ্ছিল আত্মহত্যা করবেন, কিন্তু অন্তর জন্য পারলেন না। অন্তকে বিষ খাইয়ে, নিজেও খেয়ে যে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবেন সেটাও তিনি করতে পারলেন না। এইটুকু মাসুম বাচ্চাকে তিনি কেমন করে বিষ খাইয়ে মারবেন! সব মিলিয়ে তিনি প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলেন। আর অন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কি করবে ভেবে পেল না।

তরিকুল সাহেব লোকটা এরকমই। সহজ-সরল মানুষকে বোকা বানিয়ে, অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ঠকিয়ে, প্রতারণা করেই তিনি সমাজে নিজেকে ধনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ব্যাংকের একজন সামান্য কেরানি। অথচ পুলিশের আইজি, দেশের দুই-চারজন এমপি-মন্ত্রী এবং শীর্ষ কিছু সন্ত্রাসীর সাথে তাঁর চলাফেরা। ব্যাংকের চাকরিটা তিনি শুধু লোক দেখানোর জন্য করেন। তিনি ব্যাংকের একজন নেতাও। নিজের পদোন্নতি তিনি করাতে পারেন না শুধু এইট পাশ বলে। তাছাড়া তিনি মোটামুটিভাবে যে কোনো কাজ করতে পারেন।

খুব সুন্দর প্ল্যান সাজিয়ে তিনি কাজ করেন। অন্তর আব্বা মারা যাবার পরই তিনি এই বিধবা ও এতিমকে নিয়ে প্ল্যান সাজিয়ে নিয়েছিলেন। তারই অংশ হিসেবে নিজেই অন্তদের জমিটা দখল নিয়েছেন। আর অন্তর আম্মার অসহায়ত্ব-সরলতার সুযোগ নিয়ে আদায় করে নিয়েছেন ছয় হাজার টাকা। অন্তদের মাথার উপর কোনো ছায়া না থাকায় এই কেসে বেশি বেগ পেতে হয় নি তরিকুল সাহেবকে। এর আগে তিনি এমনও কিছু কাজ করেছেন যাতে তাঁকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাঁর সাথে পেরে ওঠে নি। শেষ হাসি তিনিই হেসেছেন।

জমি-টাকা খুইয়ে এখন এই পরিবারের কি হবে, মাসুম বাচ্চাটাকে নিয়ে এই বিধবা কোথায় যাবে, কি করবে সেটা তাঁর ভাববার বিষয় নয়। মাত্র তিন কাঠা জমি আর ছয় হাজার টাকার জন্য এক অসহায়-মেরুদণ্ডহীন বিধবা ও এতিমকে তরিকুল সাহেব পথে বসিয়ে দিলেন।

তাঁর কাছে সম্পদই বড় কথা, সেটা ছোট না বড় তা কোনো ব্যাপার নয়। তিনি একটা কথা বেশ বিশ্বাস করেন–'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল; গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।' এইট পাসের মধ্যে তিনি এই কথাটা ভালোভাবে মনে গেঁথে নিতে পেরেছেন। আর তার জোরেই বানিয়েছেন বিলাসী একটা চারতলা বাড়ি। তিনি দুই টাকার একটা ছেঁড়া নোটও রাস্তায় ফেলে আসেন না। এরকম কোনো তুচ্ছ জিনিসও যদি রাস্তায় পড়ে থাকে, তিনি সেটাকে নিজের মনে করে পকেটে ঢুকিয়ে নেন। আর চামচামিতে তাঁর সমতুল্য সম্ভবত এই মহাবিশ্বে আর একটাও নেই। কখনো যদি চামচামিতে কোনো অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয় তবে তিনি নির্ঘাত চ্যাম্পিয়ন হবেন! আর তাঁর মত এত সুন্দর করে মিথ্যে কথা পৃথিবীর আর কেউ বলতে পারে কি সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে!

অন্তর আম্মা যখন পুরোপুরি দিশেহারা তখন একদিন কি মনে করে তাঁদের দখল হওয়া জমিটা দেখতে গেলেন। জমির কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। জমির মাঝখানে একটা সাইনবোর্ডে লেখা :

এই জমির মালিক
মো : তরিকুল ইসলাম

অন্তর আম্মা হিসাব মেলাতে পারলেন না। যখন তিনি হিসাব মেলানোর চেষ্টা করছেন তখন লম্বা লাঠি হাতে একটা লোক তাঁর সামনে এসে খেকিয়ে বলল, 'আপনি এইখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'

অন্তর আম্মা শান্ত গলায় বললেন, 'ভাই, এই জমিটা কার?'

'এই জমি কার সেটা জেনে আপনি কি করবেন?' লোকটা খেকিয়েই বলল।

'না মানে, এমনিই জানতে চাইছিলাম আর কি।'

লোকটা আঙুল দিয়ে সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বলল, 'যদি পড়তে জানেন তো সাইনবোর্ডটা পড়ে দেখেন। তাহলে জানতে পারবেন জমিটা কার।'

অন্তর আম্মা সাইনবোর্ডটা পড়ে দেখলেন। তারপর লোকটাকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি এখানে কি করেন?'

'আমি এখানে কি করি না করি সেটা দিয়ে আপনি কি করবেন?'

'না মানে, এমনিই জানতে চাইছিলাম আর কি।'

'আমি এই জমিটা দেখাশুনা করি।' লোকটা অন্তদের জমিটা দেখিয়ে বলল।

'আচ্ছা ভাই, জমিটা তরিকুল সাহেব কিভাবে কিনেছেন জানেন?'

'কিভাবে কিনেছেন সেটা আমি কেমন করে জানবো? আমার কাজ দেখাশুনা করা আমি দেখাশুনা করি। আর তাছাড়া আপনি এতকিছু জানতে চাইছেন কেন?' লোকটা অন্তর আম্মার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

'না মানে, এমনিই আর কি।'

'তাহলে যান, বিরক্ত করবেন না। আমাকে আমার কাজ করতে দেন।'

অন্তর আম্মা গেলেন না, দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলেন। জমিটা তাঁর অথচ তরিকুল সাহেব কিনলেন অন্য একজনের কাছ থেকে। নাকি তরিকুল সাহেব জমিটা নিজে দখল নিয়েছেন!

অন্তর আম্মা যাচ্ছেন না দেখে লাঠি হাতে লোকটা খেকিয়ে উঠে বলল, 'কি হইল, যাচ্ছেন না কেন? এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যান চলে যান।'

অন্তর আম্মার খুব কষ্ট হচ্ছে–তাঁর জমির সামনে থেকে তাঁকেই চলে যেতে বলা হচ্ছে অথচ তিনি কিছু বলতে পারছেন না। পৃথিবীর কি নির্মম নিয়ম!

লোকটা আবার খেকিয়ে উঠল, 'কি হইল, এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান বলছি, চলে যান।'

অন্তর আম্মা আর থাকলেন না। চলে এলেন। তিনি ঠিক করলেন তরিকুল সাহেবের কাছে যাবেন। জানতে চাইবেন–টানাটানির সংসারে কেমন করে তিনি জমি কিনলেন, কিভাবে কিনলেন? জমিটা তো তাঁর, এই জমি অন্যের কাছ থেকে কেন কিনলেন, কিভাবে কিনলেন? তাঁর জানতে হবে। তিনি বাসায় না গিয়ে তরিকুল সাহেবের অফিসে গেলেন।

অন্তর আম্মা তরিকুল সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই তিনি চমকে উঠলেন। হা করে তাকিয়ে থাকলেন অন্তর আম্মার দিকে। তিনি যেভাবে বলে এসেছেন তাতে অন্তর আম্মাকে তাঁর সামনে আর আশা করেন নি।

তরিকুল সাহেব মুখ হা করে রেখেই বললেন, 'আপনি কেন এসেছেন?'

অন্তর আম্মা তরিকুল সাহেবের হা করা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল।'

তরিকুল সাহেব ফাইল বন্ধ করে অন্তর আম্মাকে নিয়ে অফিসের বাইরে এলেন।

'বলেন, কি কথা বলবেন?' একটু গম্ভীর হয়ে বললেন তরিকুল সাহেব।

'আপনি নাকি জমিটা কিনে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' তরিকুল সাহেব শান্ত গলায় বললেন।

'কিভাবে কিনলেন?'

'কিভাবে কিনলাম মানে! নগদ তিন লাখ টাকায় কিনেছি।'

'তিন লাখ টাকা! আপনি তিন লাখ টাকায় জমিটা কিনেছেন!'

'হ্যাঁ কিনেছি, তাতে কি হয়েছে?'

'জমিটা আমার অথচ কিনলেন অন্যজনের কাছ থেকে। ভাই, জমিটা যদি উদ্ধার করতে পারতেন তবে এই জমিটা এর চেয়ে অর্ধেক দামে কিনতে পারতেন না? তাতে আমি অন্তত আমার এতিম বাচ্চাটাকে নিয়ে কিছু করে খেতে পারতাম!'

তরিকুল সাহেব রূঢ় হাসলেন। তিনি জমিটা কিনতে যাবেন কোন দুঃখে! তিনি এসব জমি-টমি কেনেন না। তাঁর আলাদা সিস্টেম আছে!

অন্তর আম্মা কাকুতি-মিনতি করে বললেন, 'ভাই, তিন লাখ টাকা দিয়ে যখন জমিটা কিনতে পেরেছেন তখন আমার ছয় হাজার টাকা তো আপনার কাছে কোনো ব্যাপার না। ভাই, টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিন, অন্তত ছয় হাজার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দিন, আমি মাসুম বাচ্চাটাকে নিয়ে বেঁচে থাকার পথ খুঁজি। দয়া করেন ভাই।'

তরিকুল সাহেব বিরক্ত হলেন, বললেন, 'আপনাকে আমি টাকা দিতে যাব কেন? ঐ টাকার ব্যাপারে আর কোনো কথা বলবেন না। যান, এখন চলে যান। আর আসবেন না।'

অন্তর আম্মা ধপ করে বসে পড়লেন, তরিকুল সাহেবের পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ভাই দয়া করেন। অন্তত ছয় হাজার টাকাটা আমাকে ফেরত দিন। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমকে ঐ এতিম বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু বেঁচে থাকতে দিন।'

তরিকুল সাহেব এবার মহাবিরক্ত হলেন কিন্তু বিচলিত হলেন না। এই রকম পরিস্থিতি সামাল দিয়ে তাঁর অভ্যাস আছে। তিনি অন্তর আম্মাকে ধরে তুললেন, 'ওঠেন ভাবি, ওঠেন।'

অন্তর আম্মা দাঁড়িয়ে যাবার পরও তাঁকে ছাড়লেন না তরিকুল সাহেব। অন্তর আম্মা লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন, নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। এই সুযোগে তরিকুল সাহেব তাঁর সাথে অশ্লীল আচরণ শুরু করলেন। তিনি অন্তর আম্মার শরীরে হাত বোলাতে লাগলেন। অন্তর আম্মা লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে গেলেন।

তরিকুল সাহেব অন্তর আম্মার শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে গদগদ হয়ে বললেন, 'কাঁদবেন না ভাবি, কাঁদবেন না। আরে ছয় হাজার টাকাই তো, ঠিক আছে যান দিয়ে দেবো! তবে, একটা শর্ত আছে!'

অন্তর আম্মা চমকে উঠলেন, কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কি শর্ত?'

'আপনি ঐ জমির ব্যাপারে আর কোনো কথা বলতে পারবেন না, কোনোদিন না। রাজি?'

অন্তর আম্মা একটু ভাবলেন, তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'রাজি।'
'মুখে বললে হবে না। আপনাকে একটা কাগজে সই করে দিতে হবে।'
অন্তর আম্মার সন্দেহ হল, তারপরও বললেন, 'ঠিক আছে দেবো।'
'তাহলে আপনি কয়েকদিন পর আসেন। আমি কাগজপত্র রেডি করে রাখবো।'
'ঠিক আছে।'

তরিকুল সাহেব অন্তর আম্মাকে ছেড়ে দিলেন। অন্তর আম্মা বুঝতে পারলেন এর মধ্যে তরিকুল সাহেব কোনো একটা প্যাঁচ লাগাবেন। তারপরও তিনি কোনো কথা না বলে চলে এলেন। তরিকুল সাহেবের শর্তে রাজি না হয়ে তাঁর উপায়-ই বা কি! তিনি তো এরই মধ্যে সব হারিয়ে বসে আছে! তরিকুল সাহেবের কাছে নিজেকে জিম্মি করে দিয়েছেন! তবুও তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, টাকা না নিয়ে তিনি কোনো কাগজে সই করবেন না।

কয়েকদিন পর অন্তর আম্মা তরিকুল সাহেবের অফিসে গেলেন। মনে অনেক আশা নিয়ে গেলেন তিনি। টেবিলের সামনের চেয়ার বসতেই তরিকুল সাহেব তাঁর সামনে কাগজ মেলে ধরলেন। তারপর পকেট থেকে টাকা বের করে হাতে ধরে রাখলেন। টাকা দেখে অন্তর আম্মা কাগজে সই করে দিলেন, তরিকুল সাহেব যেখানে যেখানে বললেন সব জায়গায় সই করে দিলেন। তারপর তরিকুল সাহেব তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন মাত্র দুই হাজার টাকা। বললেন–বাকি টাকা কিছুদিন পরে দেবেন। অন্তর আম্মা মানতে চাইলেন না কিন্তু তাঁকে দুই হাজার টাকা নিয়েই ফিরে আসতে হল তরিকুল সাহেবের চাপে। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, বাকি টাকা আর পাবেন না। তারপরও তাঁর কিছু করার নেই। তিনি যে অসহায়। কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে ফিরে আসতে হল।

কিছুদিন পর আবার তরিকুল সাহেবের অফিসে গেলেন অন্তর আম্মা। কিন্তু টাকা পেলেন না। তিনি বুঝে ফেললেন, তরিকুল সাহেব এভাবে রোজ ঘোরাবেন, কিন্তু টাকা দেবেন না। তিনি কিছু বলতেও পারবেন না। কাগজে এমন কিছু একটা লেখা আছে যা তাঁকে প্রতিবাদ করতে দেবে না। তিনি না পড়ে কাগজে সই করে দিয়েছেন। হায় হায় করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার রইল না।

তবুও তিনি থেমে গেলেন না। দুইদিন একদিন পর পর অন্তকে পাঠাতে লাগলেন। অন্তকে তিনি শিখিয়ে দিতেন, অন্ত তা হুবহু এসে বলত। তরিকুল সাহেব অন্তকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। তারপরও অন্তকে পাঠাতেন। টাকার জন্য নয়, তরিকুল সাহেবকে সব সময় ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে বিরক্ত করার জন্য অন্তকে পাঠাতেন। আর তাঁর আশেপাশের লোকজন যেন জানে, তরিকুল সাহেব একটা মাসুম বাচ্চাকে টাকার জন্য ঘোরাচ্ছেন। তরিকুল সাহেব অবশ্য একদিন বলে দিলেন তিনি আর টাকাটা দেবেন না। তবুও অন্তর আম্মা অন্তকে পাঠাতে থাকলেন।

তরিকুল সাহেব এখনো ঘুমাতে পারেন নি। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে তাঁর সব মনে পড়ে গেল–কিভাবে তিনি এক বিধবা আর এক এতিমকে ঠকিয়েছেন, এক মাসুম এতিমকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছেন সব তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি জীবনে অনেক লোক ঠকিয়েছেন। কিন্তু এই প্রথম তিনি একসাথে এক বিধবা ও এতিম মাসুম বাচ্চাকে ঠকিয়েছেন। আগে কখনো এসব ব্যাপারে তাঁর খারাপ লাগে নি। কেন জানি আজ তাঁর খুব খারাপ লাগছে।

তরিকুল সাহেব বেশ বুঝতে পারছেন তাঁর চোখে ঘুম আসার কোনো লক্ষণ নেই। তিনি আরেকটি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিলেন। তারপর আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তাঁর কেমন জানি ভয় করতে লাগল। তিনি স্ত্রীর আরেকটু কাছাকাছি সরে গেলেন। তাঁর নড়াচড়ায়

স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল এবং তিনি চটে গেলেন। খেকিয়ে খেকিয়ে বললেন, 'কি হল, এরকম করছ কেন? নড়াচড়া করার যদি খুব শখ থাকে তবে মেঝেতে গিয়ে শুয়ে থাকো। নিজে ঘুমাবে না বলে কি আর কাউকে ঘুমাতে হবে না?'

অন্যদিন হলে এই মুহূর্তে তরিকুল সাহেব তাঁর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া শুরু করে দিতেন। গভীর রাতে ঝগড়া করায় এই পাড়াতে তাঁরা বেশ পপুলার! কিন্তু আজ তাঁর ঝগড়া করতে মন চাইল না। তিনি চুপচাপ শুয়ে থাকলেন।

বারবার তাঁর চোখের সামনে মাসুম বাচ্চাটার মুখ ভেসে উঠছে। আজ তিনি খুব বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছেন তার সাথে। ছেলেটাও অবশ্য খুব বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে। কিন্তু তাতে তাকে দোষ দেবার কিছু নেই। রোজ সে টাকা নিতে এসে ঘুরে যায়, মাঝে মাঝে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। বাড়িতে সে তার মাকে কাঁদতে দেখে, সারাক্ষণ কাঁদতে দেখে। মাকে কাঁদতে দেখলে যে কেউ-ই কষ্ট পাবে। আর তাই ছেলেটার এমন আচারণে কোনো দোষ দেখছেন না তরিকুল সাহেব। গতকালও ছেলেটার জন্য তাঁর এতটুকু দয়া-মায়া হয় নি অথচ আজ তাঁর মনে হচ্ছে তিনি ভুল করেছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না কেন তাঁর এরকম লাগছে।

তরিকুল সাহেবের মনে পড়ে গেল, ছেলেটাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবার সময় সে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছে! তাঁকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়েছে! হঠাৎ করে তাঁর খুব ভয় লাগতে লাগল। একটা এতিম বাচ্চা তাঁকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়েছে! এ জন্যই কি তাঁর শরীর এরকম করছে! তিনি কি মারা যাবেন!

তারিকুল সাহেব তওবা পড়তে লাগলেন। তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে মাফ চাইতে লাগলেন। আর ঠিক করলেন কালই তিনি তিন কাঠা জমি এবং বাকি চার হাজার টাকা ঐ বিধবা ও এতিমকে বুঝিয়ে দেবেন। প্রয়োজনে এর বাইরেও তাদের সাহায্য করবেন। তিনি আরো ঠিক করলেন আর কাউকে তিনি কোনোদিন ঠকাবেন না, কারো সাথে প্রতারণা করবেন না। পারলে এখন থেকে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন, তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবেন। তিনি ভালো হয়ে যাবেন।

তরিকুল সাহেব শব্দ করে তওবা পড়তে লাগলেন। এই মুহূর্তে তাঁর বেশ ভয় করতে লাগল। তাঁর আর ঘুমাতে মন চাইল না। তাঁর মনে হতে লাগল একবার তিনি চোখ বন্ধ করলে আর কোনোদিন খুলতে পারবেন না। এই ভয়ে তিনি আজ রাতে আর ঘুমাবেন না ঠিক করলেন। কিন্তু তিনি পারলেন না, নিজের অজান্তেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

সে ঘুম আর ভাঙল না!

ক্ষুধার জ্বালা

নদীর ঘাটে নৌকায় বসে অপেক্ষা করছে কলিম সিদ্দিক। তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে সে এই নদীতে মাঝিগিরি করে। নদীটি ছোট, পানিও খুব বেশি থাকে না। বর্ষাকালে একবার পানিতে টইটুম্বর হয়ে যায় নদীটি, থাকে পরের তিন-চার মাস। বছরের বাকি সময় গলা পানি কোমর পানিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবুও কলিম সিদ্দিক নৌকা নিয়ে বসে থাকে নদীর ঘাটে।

ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হতে পারে–কলিম সিদ্দিক যেখানে নৌকা নিয়ে বসে আছে সেখান থেকে মাত্র গজ পঞ্চাশেক দূরেই একটা ব্রিজ আছে। এই নদীটা পার হওয়ার জন্য এখন আর নৌকার কোনো প্রয়োজন নেই। পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যাবে। কিন্তু, তবুও কলিম সিদ্দিক নদীর ঘাটে নৌকা নিয়ে বসে থাকে। একটা লোকের জন্য, লোকটা ব্রিজ দিয়ে নদী পার হন না, কলিম সিদ্দিকের নৌকাতেই পার হন। প্রতিদিন এবং দিনে যতবার লোকটার নদীর ওপারে কিংবা নদী পথে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে ততবারই তিনি কলিম সিদ্দিকের নৌকায় যাতায়াত করেন। কলিম সিদ্দিকের নৌকায় যাতায়াত করে লোকটা তাঁর দিলে বিশেষ এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করেন, মজা পান!

লোকটার নাম মাওলানা আব্দুল গাফ্‌ফার খান। বেশ খানদানি মানুষ, এলেমদার। এলাকায় বেশ জনপ্রিয়তা আছে। তবে গ্রামের প্রবীণ ও মধ্য বয়স্ক বেশ কিছু লোক তাঁকে বিশেষ একটা কারণে পছন্দ করে না, কলিম সিদ্দিকও না। কিন্তু কলিম সিদ্দিকের তা প্রকাশ করার উপায় নেই। এই লোকটার কারণেই সে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। এই লোকটাকে নদী পার করে দিয়ে সে বিশ টাকার কড়কড়ে একটা নোট পায়, ফিরতি পথে পায় আরো বিশ। এই গ্রামের ছোট্ট নদীটা পার করে আর কার কাছ থেকে সে চল্লিশ টাকা পাবে? লোকটা দিনে তিন-চারবার নদী পার হন কিংবা নদী পথে যাতায়াত করেন, কোনো কোনো দিন আরো বেশি। প্রতিবারই মাওলানা খান চল্লিশ টাকা করে দেন। লোকটাকে পছন্দ না হলেও কলিম সিদ্দিক তা প্রকাশ করতে যাবে কোন দুঃখে?

লোকটার আসার সময় হয়ে গেছে। কলিম সিদ্দিক নৌকায় পেতে রাখা পাটিটা ভালোভাবে মুছে পরিস্কার করল। পাটিটা একটু নোংরা থাকলে মাওলানা সাহেব রাগ করেন, বকাঝকা করেন। কলিম সিদ্দিক তাই খান সাহেব আসার আগ পর্যন্ত একটু পর পর পাটিটা মুছে পরিস্কার করে।

খান সাহেব আসছেন। তাঁর হাঁটার মধ্যে দাম্ভিকতার একটা ভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাই বহুদূর থেকেই তাঁকে চেনা যায়। তাঁর পেছনে একটা ছেলে ছাতা ধরে আছে, তার নাম রইস। খান সাহেবের পরনে লম্বা সাদা রংয়ের হাতের কাজ করা পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা, পায়ে চামড়ার সেন্ডেল, হাতে চায়না ঘড়ি এবং মাথায় ঢাউস আকৃতির একটা টুপি। তাঁর মুখভর্তি পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা চাপ দাঁড়ি এবং পান খাওয়ার কারণে লাল টকটকে ঠোঁট। তিনি ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ পান চিবান, এমনকি টয়লেটে গিয়েও!

খান সাহেবকে আসতে দেখে কলিম সিদ্দিক নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নামল। আরেকবার পাটিটা মুছে পরিস্কার করল। তারপর মাথায় গামছা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকল।

খান সাহেব কাছাকাছি আসতেই কলিম সিদ্দিক সালাম দিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম মিয়া বাই।'

খান সাহেব মুখভর্তি পানের পিক থেকে খানিকটা ফেলার চেষ্টা করলেন। খানিকটা মাটিতে গিয়ে পড়ল এবং বাকিটা তাঁর ঠোঁট বেয়ে সাদা পাঞ্জাবি রাঙিয়ে দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'অলাইকুম আস্‌সালাম। কি গো কলিম, কেমুন আছো?'

মুখ ভর্তি পানের পিক নিয়ে কথা বলতে সমস্যা হলেও খান সাহেব অত সহজে তা মাটিতে ফেলেন না, মাঝে মধ্যে দুই-একবার মাত্র ফেলেন। তাঁর মতে, পানের পিক মাটিতে ফেলা মানে পান কেনার টাকাগুলো মাটিতে ফেলে দেয়া। আর তাছাড়া পানের পিক মুখে পুরে রাখতেই তিনি পছন্দ করেন।

কলিম সিদ্দিক মুচকি হাসি দিয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, 'আছি বাই আপনেগো দোয়ায়।'

খান সাহেব একা একা নৌকায় উঠতে পারেন না। কলিম সিদ্দিক ও রইস দুইজনে ধরে তাঁকে নৌকায় তোলে। খান সাহেবের শরীর-স্বাস্থ্য মাশাল্লাহ্! ৯৫ কেজি ওজন নিয়ে তিনি কোনো রকমে হেঁটে চলে বেড়ান। নৌকা-রিক্সায় উঠতে গেলে তাঁকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়, এমনকি বিছানায় উঠতে গেলেও মাঝে মাঝে তাঁকে বউয়ের সাহায্য নিতে হয়! কলিম সিদ্দিকের মাঝে মাঝে ভয় হয়, কবে না জানি খান সাহেবের ভারে নদীর মাঝখানে নৌকাটা ডুবে যায়!

খান সাহেবের ওঠা নামার সুবিধার জন্য কলিম সিদ্দিক নৌকায় একটা কাঠের তক্তা রেখেছে। সেটা বেয়ে উঠতেও খান সাহেবের রইসের সাহায্য লাগে। আজও রইসের ঘাড়ে ভর দিয়ে তিনি নৌকায় উঠলেন। পাটিতে আয়েশ করে বসে মুখভর্তি পানের পিক থেকে খানিকটা গিলে নিয়ে বললেন, 'কলিম, আইজ উত্তরের গ্রামটায় চলো। একখান সালিশ আছে।'

'জে আচ্ছা মিয়া বাই।'

কলিম সিদ্দিক ঠেলে নৌকাটাকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে এক লাফে নৌকায় উঠে বসল, ঠিক তখন খান সাহেব বললেন, 'কলিম, তোমারে না বলছি নৌকা স্টার্ট দেয়ার সময় জোরে কইরা বিসমিল্লাহ্ বলবা?'

কলিম সিদ্দিক মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'ভুল হয়া গেছে মিয়া বাই।'

'ভুল তো তুমি আইজকা প্রথম করো নাই।' খান সাহেব খেকিয়ে উঠলেন, 'তোমারে কতবার বলছি যে কোনো কাজ স্টার্ট নেয়ার সময় জোরে কইরা বিসমিল্লাহ্ বলবা।'

কলিম সিদ্দিক মাথা নিচু করে বসে থাকল, কিছু বলল না। খান সাহেব আবার খেকিয়ে উঠলেন, 'তোমাগো আসলে শেখনের কোনো ইচ্ছা নাই। তোমরা আজীবন মূর্খই থাকবা। মাত্র একটা শব্দ বলতে তোমাগো মনে থাকে না! তোমরা মুসলমান নামের কলঙ্ক! একজন মুসলমান হইয়া তোমার বিসমিল্লাহ্ বলার কথা মনে থাকে না! ছি! ছি!' খান সাহেব মুখ বিকৃতি করে কলিম সিদ্দিকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কলিম সিদ্দিক মাথা নিচু করে রেখেই বলল, 'এইবার মাফ কইরা দেন মিয়া বাই, আর ভুল হইবো না।'

খান সাহেব এবার একটু শান্ত হলেন। কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি চালাও।'

কলিম সিদ্দিক জোরে করে বিসমিল্লাহ্ বলে হাল বাইতে লাগল।

খান সাহেব মনে মনে বেশ আনন্দ পেলেন। কলিম সিদ্দিককে হেয় করে, অপমান করে, বকাঝকা করে তিনি বিশেষ একটা কারণে বেশ আনন্দ পান।

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ নিরবতার পর কলিম সিদ্দিক নিরবতা ভাঙ্গল, 'আইজকা কি নিয়া সালিশ মিয়া বাই?'

খান সাহেব উদাস ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কলিম সিদ্দিকের দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়া কাঁচাল। চিন্তা করো কলিম, একই মায়ের পেটের দুই ভাই মারামারি-কাটাকাটি কইরা ফেলাইল!'

'মারামারি-কাটাকাটি!'

'হ, ঘটনা বেশ জটিল। যাই দেখি কি করবার পারি।'

কলিম সিদ্দিক আর খান সাহেবের মধ্যে এমনিতে খুব ভাব। খান সাহেব যখন কোনো সালিশে যান তখন কি নিয়ে সালিশ তা কলিম সিদ্দিকের কাছে গল্প করেন, মাঝে মধ্যে বুদ্ধি-পরামর্শও নেন। আবার সালিশ শেষে ফেরার সময় সালিশের বিস্তারিত গল্প কলিম সিদ্দিকের কাছে করেন। শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে কলিম সিদ্দিককে প্রায়ই অকাট্য ভাষায় গালি-গালাজ করেন খান সাহেব। এ কারণে কলিম সিদ্দিক খান সাহেবকে খুব ঘৃণা করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। শত কিছুর পরও এই লোকটার কারণেই সে পরিবার নিয়ে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে।

কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর খান সাহেব বললেন, 'তা কলিম, দিনকাল কেমুন চলতাছে তোমার?'

'কোনো রকমে চলতাছে আর কি।' অনির্দিষ্ট একটা দিকে তাকিয়ে থেকে হাল বাইতে বাইতে বলল কলিম সিদ্দিক।

'শুনলাম তোমার ছোড পোলারে নাকি হোটেলের কামে দিছো?'

'হ, মিয়া বাই। পড়াশুনা করে না, তাই লাগায়া দিলাম।'

'তুমি তো মিয়া কোনো পোলা-মাইয়ারেই পড়াশুনা শিখায়া মানুষ করবার পারলা না।' খান সাহেব মুখ বিকৃতি করে একটু বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'বড় দুই পোলার তো কোনো খোঁজ খবরই নাই। মাইয়াগুলারও বিয়া-সাদি দিবার পারলা না। একটার দিয়াও তো লাভ হইল না, শেষমেষ দুইটা বাচ্চা নিয়া তোমার ঘাড়েই আইসা পড়ল।'

'কি করব মিয়া বাই, সবই আমার কপাল!' একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বলল কলিম সিদ্দিক।

খান সাহেব মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'কপাল না ছাই! সব তোমার স্বভাবের দোষ।'

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মুখ বিকৃতি করে খান সাহেব বললেন, 'কই, তোমার দ্যাশ তোমারে কি দিল? তোমার বাংলাদ্যাশ তোমারে কি দিল? খুব তো যুদ্ধ কইরা দ্যাশ স্বাধীন করলা, এখন কই গ্যালো তোমার দ্যাশ? কই গ্যালো তোমার নেতারা?'

কলিম সিদ্দিক বুঝে গেল সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা শুরু করেছেন খান সাহেব। কলিম সিদ্দিক কোনা কথা বলল না। জোরো জোরে হাল বাইতে লাগল।

এটা কলিম সিদ্দিকের কাছে নিয়মিত ঘটনা। সুযোগ পেলেই খান সাহেব কলিম সিদ্দিককে অপমান করেন, গালি-গালাজ করেন, মুখ ঝামটা দেন। এর জন্যই খান সাহেব কলিম সিদ্দিকের নৌকায় সব সময় যাতায়াত করেন। কলিম সিদ্দিকেরও কিছু বলার থাকে না, সে কিছু বলতে পারে না। মুখ বুঁজে, দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে নেয়, সহ্য করে নিতে হয় তাকে আটটি পেটের কথা ভেবে।

খান সাহেব আবারো মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'খুব তো রাজাকার রাজাকার বইলা গালি দিছিলা। এখন কই গ্যালো তোমার সেই তেজ?' খান সাহেব তাঁর বুকে থাবা দিয়ে বললেন, 'এখন এই রাজাকারের দয়ায় খাইয়া-পইরা বাঁইচা আছো। এই রাজাকার দয়া না দেখাইলে গোটা গুস্টি সুদ্দা না খায়া মরবা।'

খান সাহেব কথাটা অবশ্য ভুল বলেন নি। কিন্তু খান সাহেবের মুখ থেকে এই সত্য কথাটা শুনতেও ঘৃণা হয় কলিম সিদ্দিকের। তবুও তাকে শুনতে হয়। এই রকম মুহূর্তে কলিম সিদ্দিক কোনো কথা বলে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু শোনে, খান সাহেবের মুখের দিকেও তাকায় না। আর জোরে জোরে হাল বাইতে থাকে। খান সাহেব বলতে বলতে এক সময় নিজে থেকেই থেমে যান।

কলিম সিদ্দিক মুক্তিযুদ্ধ করেছে। সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায় নি, কেউ তাকে দেখতে আসে নি। কলিম সিদ্দিক কত জায়গায় ধরনা দিয়েছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নি।

মুক্তিযুদ্ধের পর কলিম সিদ্দিক যখন কোনো কাজ পাচ্ছিল না তখন সে ধার-দেনা করে একটা নৌকা বানিয়ে এই নদীতে মাঝিগিরি শুরু করে। ভালোই চলছিল তার। তিন ছেলে তিন মেয়েকে নিয়ে যখন সে মোটামুটি সুখে দিন কাটাচ্ছিল তখনই এই নদীতে ব্রিজটা তৈরি করা হল। কলিম সিদ্দিকের মত অনেকেই কাজ হারাল। এই সময় খান সাহেব কলিম সিদ্দিককে তাঁর সাথে কাজ করার জন্য ডেকেছিলেন। কিন্তু কলিম সিদ্দিক রাজাকারের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজি হয় নি।

তারপর থেকে তিন-চার বছর কলিম সিদ্দিক তেমন কোনো কাজ জোটাতে পারে নি। এই সময়ে সে ইট ভাটায় কাজ করেছে, কিছুদিন ভ্যান চালিয়েছে, শরীরে কুলায় না বলে বেশিদিন তা পারে নি, কিছুদিন মাটি কাটার কাজ করেছে, এখানেও শরীরে না কুলানোয় বেশিদিন করতে পারে নি। অবশেষে তাকে কাজ ছাড়াই দিন কাটাতে হচ্ছিল, অর্ধহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছিল, তখন খান সাহেব কলিম সিদ্দিককে আবারো একটা প্রস্তাব দেয়। আটটি পেটের কথা ভেবে সে প্রস্তাবে কলিম সিদ্দিক রাজি হয়ে যায়। সেই থেকে কলিম সিদ্দিক খান সাহেবের ভাড়া করা মাঝি হয়ে যায়। আর মাঝে মধ্যেই খান সাহেবের অকাট্য গালি-গালাজ সহ্য করতে হয়। সেই থেকে কলিম সিদ্দিক খান সাহেবের গালি-গালাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না। তার আগ পর্যন্ত খান সাহেব কখনো কলিম সিদ্দিকের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না।

খান সাহেব আবার খেকিয়ে উঠলেন, 'যুদ্ধের পর কত কইরা কইলাম আসো আমরা এক লগে কাম করি। না, তুমি শুনলা না, রাজাকারের লগে হাত মিলাইবা না, রাজাকারের লগে কাম করবা না, রাজাকাররে গুল্লি কইরা মারবা। শালা মূর্খের দল।'

খান সাহেব মাঝে মাঝে এত বাজে ভাষায় কথা বলে যে কলিম সিদ্দিকের গায়ে আগুন লেগে যাবার মত অবস্থা হয়! কলিম সিদ্দিকের মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই রাজাকারের বাচ্চাকে মাঝ নদীতে ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু পারে না। ১৯৭১-এ যে তেজ নিয়ে, যে জেদ নিয়ে সে যুদ্ধ করেছিল সে তেজ, সে জেদ আর জাগাতে পারে না। আটটি পেটের ক্ষুধার জ্বালার কথা ভেবে সে এই রাজাকারের বাচ্চাকে কিছুই বলতে পারে না, ডুবিয়ে দিতে পারে না মাঝ নদীতে। এই রাজাকারের বাচ্চার সব অপমান, তাচ্ছিল্য, অকাট্য গালাগাল মুখ বুঁজে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যেতে হয় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চোখের পানিতে বালিশ ভেজাতে হয়।

'এই তোমাগো মতন মূর্খ মানুষের কারণেই দ্যাশের আইজ এই অবস্থা। কত চিল্লাফাল্লা বাংলাদ্যাশ হইবো, বাংলাদ্যাশ! ক্যানরে ভাই, পাকিস্তান থাকলে কি ক্ষতি হইত!' খান সাহেব দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন।

কলিম সিদ্দিকের ইচ্ছে হচ্ছিল আজকেই শালাকে নদীর মাঝখানে ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করতে পারল না। সে আরো জোরে হাল বাইতে লাগল। যত তাড়াতাড়ি খান সাহেবকে গন্তেব্যে পৌঁছে দিতে পারবে তত তাড়াতাড়ি সে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

খান সাহেব গলায় জোর দিয়ে, নৌকার পাটাতনে থাবা দিয়ে বললেন, 'আইজ যদি এই দ্যাশ পাকিস্তান থাকত, তাইলে দেখতা দ্যাশের একটা মানুষও না খায়া মরত না।'

খান সাহেবের চামচা রইস খান সাহেবের কথার সাথে যোগ করল, 'একটা মানুষরেও ভিক্ষা করতে হইত না।'

কলিম সিদ্দিকের ইচ্ছে হচ্ছিল রাজাকার শালার বেটার কানের উপর থাপ্পর মেরে বলে, 'পাকিস্তানের জন্য যখন তোমার এতই দরদ তখন এই দ্যাশে পইড়া আছো ক্যান? পাকিস্তানে যাও গা, দেখি কে তোমারে থাকতে দেয়, কে তোমারে ভাত দেয়।'

কিন্তু কলিম সিদ্দিক কিছুই বলতে পারল না। সে আরো জোরে হাল বাইতে লাগল। একাত্তরের সেই তেজ, সেই জেদ সে আর কিছুতেই জাগাতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালার কাছে

তার একাত্তরের তেজ পরাজিত হয়ে যায়। মুখ বুঁজে, দাঁতে দাঁত চেপে রাজাকার শালার বেটার অপমান, তাচ্ছিল্য সহ্য করে নিতে হয় তাকে।

বেশ কিছুক্ষণ খান সাহেব রাগে ফুসতে থাকলেন, কোনো কথা বললেন না।

গন্তব্যে চলে এসেছে নৌকা। কলিম সিদ্দিক ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে কাঠের তক্তাটা পেতে দিল। খান সাহেব রাগে ফুঁসছেন। তিনি মুখ থেকে এক দলা থুতু নদীর পানিতে ফেললেন। তারপর একটা পান মুখে ভরে রইসের ঘাড়ে ভর দিয়ে তক্তা বেয়ে নামলেন। পকেট থেকে বিশ টাকার একটা নোট বের করে সেটা কলিম সিদ্দিকের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা শব্দ করে বললেন, 'বাংলাদ্যাশ!'

খান সাহেব কোনোদিন কলিম সিদ্দিকের হাতে টাকা দেন না। সব সময় ছুঁড়ে মারেন। মাটিতে পড়ে থাকে টাকা। কলিম সিদ্দিককে নিজে তুলে নিতে হয়, মাথা নুইয়ে মাটি থেকে তুলে নিতে হয়। মাটি থেকে টাকা তুলে নিতে গিয়ে কলিম সিদ্দিকের বুক ফেটে যায়, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসে। কিন্তু তবুও তাকে সহ্য করতে হয়, মেনে নিতে হয়। মাটি থেকে টাকাটা কুড়িয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে হয়।

শুধু ক্ষুধার জ্বালা সয় না বলে!

[এই গল্পের কোনো উক্তি বা কোনো অংশ যদি কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা কোনো ব্যাক্তির মনে আঘাত করে থাকে তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কাউকে আঘাত করতে নয়, এই কাল্পনিক গল্পের মাধ্যমে আমি শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থার করুণ চিত্রের কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এর চেয়েও অনেক করুণ অবস্থায় আছেন। পত্রিকায় এমনও পড়েছি মুক্তিযোদ্ধারা ভিক্ষা করছেন! এই দেশের যাঁরা কারিগর তাঁরা ভিক্ষা করবেন, অসহায় জীবন-যাপন করবেন এটা মেনে নেয়া কষ্টকর।]

হিসাব না মেলে

খুব বেলা পর্যন্ত ঘুমানোর জন্য যদি কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত তবে সম্ভবত সে পুরস্কারটা আমার ছাড়া আর কারো কপালে জুটত না! প্রতিদিনই আমি খুব বেলা করে ঘুম থেকে উঠি। অবশ্য অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। কোনো কোনো দিন আবার রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যায়। কত মানুষের পাখির ডাক শুনে ঘুম ভাঙে আর আমি কতদিন পাখির ডাক শুনে ঘুমাতে যাই। মাঝে মাঝে বাড়ির সবাই যখন জেগে ওঠে তখন আমি ঘুমাতে যাই। সে সব দিন ঘুম ভাঙতে দুপুর হয়ে যায়। তবে, খুব বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমি যদি রাত দশটার সময়ও ঘুমিয়ে পড়ি তবুও বেলা দশটা-এগারোটার আগে আমার ঘুম ভাঙে না।

প্রতিদিনই আমার ভাগ্নে সাত সকালে এসে কানের কাছে প্যানপ্যান শুরু করে। আমি রেগে গিয়ে ওর দিকে তেড়ে যাই। কিন্তু, ধরতে পারি না। পিচ্চিতো, সুরুত করে পালায়। কিছুক্ষণ পর আবার এসে প্যানপ্যান শুরু করে। আবার আমি তেড়ে যাই। দরজা লাগিয়েও শান্তি নাই, এই শয়তান দরজায় জোরে জোরে থাবা মারতে থাকে। হিমেল স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাই না। সকাল সাতটায় ও স্কুলে চলে যায়। ও স্কুলে চলে গেলে আমাকে আর পায় কে? আর কেউ জ্বালাতে আসে না। মাঝে মাঝে অবশ্য বুবু এসে গায়ে গরম পানি ঢেলে দেয়। মাথায় রক্ত উঠে যায় তখন। বুবু বলে কিছু বলতে পারি না। গা মুছে আবার ঘুম দেই। তবে, প্রতিদিন বুবু এই কাজ করে না। যে দিন কোনো কারণে বুবুর মেজাজ খুব খারাপ থাকে সে দিনই শুধু এই কাজ করে।

ওরা কেউ জানে না আমি কত রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। জানলে বুঝতো। আমি যে রাত জেগে খুব পড়াশোনা করি তা কিন্তু নয়। পড়াশোনা আমার একদম ভালো লাগে না। কোনো রকমে ম্যাট্রিক-আইএ পাশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছি। তবে বের হতে পারব কিনা সে ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় আমি এক সাবজেক্টে ফেল করেছি। দ্বিতীয় বর্ষের খাতায় নাম উঠলেও ঐ সাবজেক্টে আবার পরীক্ষা দিতে হবে। আবার যদি ফেল করি তাহলে কি হবে আমি এখনো জানি না।

তাহলে রাত জাগি কেন? আসলে আমি খুব স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখতে দেখতে রাত পেরিয়ে যায় আর দিনের যে সময়টুকু জেগে থাকি তা যায় এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে। এ পর্যন্ত কতদিন আমি ভার্সিটিতে ক্লাস করেছি তা আমার নিজেরও মনে নেই। রাতে আমি স্বপ্ন দেখি জেগে জেগে। স্বপ্ন দেখি বিখ্যাত হবার, স্বপ্ন দেখি দেশের চেহারা বদলের, স্বপ্ন দেখি অস্বচ্ছল মানুষের অবস্থা বদলের। আরো স্বপ্ন দেখি লাল টুকটুকে বউয়ের। তবে, এ স্বপ্ন রোজ রোজ দেখি না। ভয় হয় মাঝে মাঝে। বিয়ের পরও যদি রাত জাগা ও বেলা করে ঘুমানোর অভ্যাস থেকে যায়! আর বউটা যদি রোজ রোজ আমার গায়ে গরম পানি ঢেলে দেয়! তাহলে তো আমার আর আমার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে! তাই এই স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত থাকি।

কোনো কোনো রাতে অবশ্য একটু-আধটু কবিতা-টবিতা লিখি। কবিতাগুলো মাঝে মাঝে পত্রিকায় পাঠাই। কিন্তু এ পর্যন্ত একদিনও ছাপে নি। এতে আমার অবশ্য কোনো আপসোস নাই।

কোনো কোনো দিন সকালে উঠে আমি নাস্তা পাই না। শাস্তি, দেরি করে ওঠার জন্য। কিন্তু না খেয়ে থাকি না। মোড়ের হোটেলে গিয়ে দুলাভাইয়ের নাম করে খেয়ে নিই। পরে অবশ্য দুলাভাইয়ের ঝাড়ি খাই কিন্তু গায়ে মাখি না। আমার দুলাভাই মানুষটা খুব ভালো। আমাকে বকতে হয় বলেই বকেন। কখনো মন থেকে বকেন না।

সকালে, মানে অন্যদের জন্য যখন অনেক বেলা, সবাই যখন খুব ব্যস্ত তখন আমি ঘুরত বের হই। এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করি। কোনো কোনো দিন বিশাল ভবন নির্মাণের

জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রমিকদের কাজ দেখি। কত কষ্ট করে ইট, বালি, সিমেন্ট বহন করে নিয়ে যায় ওরা। কত কষ্ট হয় একটু একটু উপলব্ধি করতে পারি। মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছে হয় একটু হাত লাগিয়ে টেস্ট করে দেখতে। কিন্তু ভয় হয় যদি না পারি! তাই আর এগিয়ে যাই না।

কোনো কোনো দিন বস্তির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াই। তাদের বসতগুলো দেখি। কি জীর্ণ, কি নোংরা পরিবেশ। এই পরিবেশে এরা কীভাবে দিন কাটায় কে জানে! বস্তির কোনো কোনো গলিতে আবার নেশার আড্ডা দেখি। নেশাগ্রস্থ মানুষের চোখের দিকে, মুখের দিকে তাকালেই ভয় লাগে। তখন বস্তি থেকে পালিয়ে আসি। তবে, কানে বাজে ঝগড়ার কর্কশ ধ্বনি, ছোট্ট শিশুর ক্ষুধার জ্বালায় কান্না–এই সব। এই সব রাতেও মনে পড়ে। তখন খুব খারাপ লাগে, কষ্ট হয়।

কোনো কোনো দিন রাস্তায় একা একা হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতে দেখি কিছু ছেলেমেয়ে বস্তা ঘাড়ে নিয়ে ছোটাছুটি করছে আর কাগজ কুড়াচ্ছে। তাদের কেউ কেউ দেখি ডাস্টবিনের ভেতরে ঢুকে যায়। উল্টে পাল্টে কাগজ খোঁজে। আবার ময়লা-আবর্জনার মধ্যে থেকে কিছু তুলে মুখে দেয়। কিছু যেন খেতে থাকে ওরা। এই দৃশ্য দেখে আরো খারাপ লাগে, চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, বুকের ভেতরে ব্যথা অনুভব করি। ভাবি, এরা সারাদিন পরিশ্রম করেও ডাস্টবিনের পঁচা খাবার খায়। আর আমি সারাদিন টোঁ টোঁ করে ঘুরে, ঘুমিয়ে কত ভালো ভালো খাবার খাই। খারাপ লাগেলেও আমার কিছু করার নেই, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি। রাতে যখন এসব চোখের সামনে ভাসে, তখন আর ঘুম আসে না।

এভাবে রাত জেগে, অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে, ঘুরে-বেরিয়ে মানুষের অসহায়ত্ব দেখে আমার প্রতিটা দিন কাটে।

এখন রাত একটা। চারিদিক নিস্তব্ধ। গোটা শহর ঘুমিয়ে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু আমার ঘরের সিলিং ফ্যানটাতে মাঝে মাঝে ক্যাট ক্যাট একটা শব্দ হচ্ছে, সাথে বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ। এর বাইরে আর কোনো শব্দ হচ্ছে বলে মনে হয় না। এ বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু আমিই জেগে আছি। অন্ধকার নিস্তব্ধ এ রকম রাতে একা একা জেগে থাকার মাঝে একটা কিছু আছে যার কারণে আমার এ রকম মুহূর্তে খুব ভালো লাগে। অন্যেরা এটা বোঝে না। যারা রাত জেগে পড়াশোনা করে তারা বোঝে কিনা জানি না। বোঝার কথা না কারণ যারা রাত জেগে পড়াশোনা করে তারা খুব ভালো ছাত্র বা ছাত্রী হয়। এসব আজগুবি বিষয় নিয়ে তারা সম্ভবত ভাবে না।

এটাকে আমি কোনো ক্রমেই আজগুবি মানি না। এটা আমার বুবুর ডায়লগ। আমার কাছে সত্যিই মনে হয় রাত জাগার মাঝে ভালো লাগার মত কিছু একটা আছে। এরকম সময় খুব কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে। শুনেছি লেখকেরা নাকি খুব রাত জেগে লেখালেখি করেন। আমার রাত জাগার পেছনে এটা একটা কারণ হতে পারে। আমিও একটু-আধটু লেখালেখি করি কিনা!

এখন আমি আমার টেবিলে বসে একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছি। কয়েকটা কাগজ নষ্ট করে দুটো লাইন লিখেছি–

যদি তুমি হারিয়ে যাও অজানা পথে,
তবে, কেমন করে খুঁজে পাবো তোমাকে?

বাহ! অসাধারণ হয়েছে! কিন্তু আমার সমস্যাটা এখানেই। যখন কোনো কিছু লিখবো বলে মনস্থ করি তখন মনে মনে সেটা নিয়ে খুব ভাবি। তখন কত কিছু মাথায় আসে, এটা লিখবো সেটা লিখবো, এটাকে এভাবে ওটাকে ওভাবে। কিন্তু লিখতে গেলেই যেন আর কিছু আসে না। এক লাইন দুই লাইন হবার পর আর কলম চলে না। ঐটুকু লিখতেও খরচ হয় কয়েকটা কাগজ।

আমি একবার ঠিক করলাম একটা উপন্যাস লিখবো। দুঃখী মানুষদের নিয়ে, পথের মানুষদের নিয়ে, অসহায়-সম্বলহীন মানুষদের জীবন নিয়ে ফাটাফাটি একটা উপন্যাস লিখবো ঠিক করলাম। এক রাতে শুরুও করে দিলাম। গুনে গুনে আঠারো পৃষ্ঠা লিখে ফেললাম। এর পরই বাঁধল সমস্যা। কাহিনী এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকলো যে, এখন সেটাকে কোন দিকে নিয়ে যাবো সেটা আর ভেবে পেলাম না। তাই উপন্যাসটাও আর লেখা হল না। বহুদিন হয়ে গেল এখনো ঐ আঠারো পৃষ্ঠাই আছে। আর এক অক্ষরও বাড়াতে পারি নি। একবার ভেবেছিলাম ছিড়ে ফেলব কিন্তু তা আর পারি নি। খুব মায়া হচ্ছিল। তবে, কোনো একদিন হয়তো বা দেখব একটা পৃষ্ঠাও নাই। বুবু হয়তো কোনো একদিন সব ছিড়ে ফেলবে।

একবার আমি সারারাত জেগে একটা পূর্ণাঙ্গ কবিতা লিখেছিলাম। ওটাই আমার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ কবিতা। সকালে কবিতাটা পত্রিকায় পাঠাবো বলে লিখছি, তখন বুবু এসে আমাকে বলল, 'এই যে নবাব সজলউদ্দৌলা, যান আজকে একটু বাজার করে আনেন।'

আমি বললাম, 'এখন পারব না। কাজ করছি।'

বুবু বলল, 'কি করছিস?'

আমি বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'কাল রাতে একটা ফাটাফাটি কবিতা লিখেছি। সেটা পত্রিকায় পাঠাবো বলে লিখছি। একটু পর এটা নিয়ে পোস্ট অফিস যাবো। আমি বিকেলে তোমাকে বাজার করে দেবো। এখন পারব না।'

বুবু তখন মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'বিকেলে পঁচা জিনিস কেনার জন্য তোকে আমি বাজারে পাঠাবো?'

'ঠিক আছে, তাহলে কালকে করে দেবো। কিন্তু এখন পারব না। রোদে পুড়ে বাজার করার চেয়ে এটা আমার কাছে অনেক ইমপর্টেন্ট কাজ।'

'তার মানে এখন তুই যাবি না?'

বুবুর কথা শুনে একটু ভয় লাগলেও বললাম, 'না, এখন কোনো ক্রমেই আমার দ্বারা সম্ভব না। আমার সকালের সিডিউল বুকড্। বিকেলে ফাঁকা। বিকেলে না চাইলে তুমি কাল সকালের সিডিউল বুক করতে পারো। কিন্তু এখন পারব না।'

এই কথা বলে দুই সেকেণ্ডও দম নিতে পারি নি, বুবু কবিতার কাগজটা নিয়ে একেবারে কুটিকুটি করে ফেলল, বলল, 'আজ দুপুরে তোর খাওয়া বন্ধ। নে, এখন যত খুশি কবিতা লিখ আর পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্ট করে আয়।'

কি যে কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন! বলার মত না। কিন্তু কিছু বলতে পারি নি। বাজারও করে দেই নি। রাগ করে বসে ছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল বাসা ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু তা পারি নি। বাসা ছেড়ে যাবো কোথায়? গেলাম না হয় কিন্তু খাব কি? ডাস্টবিনের পঁচা খাবার! কক্ষোনো না। তাই আর বাসা ছেড়ে গেলাম না।

ঐ দিন দুপুরে আমি সত্যি সত্যি খাবার পাই নি। আমি বাজার করে দেই নি বলে কিছু থেমে থাকে নি। বুবু নিজেই বাজার করে এনেছিল। আমিও অবশ্য না খেয়ে থাকি নি। দুপুরে সাবার খাওয়া হয়ে যাবার পর চুপ চুপ করে মোড়ের হোটেলে গিয়ে খেয়ে এসেছিলাম যথারীতি দুলাভাইয়ের নামে। দুলাভাই অফিস থেকে ফিরে এসে আমাকে বেশ ধামকি-ধুমকি দিয়ে দিলেন। তবে, দুলাভাই মানুষটা খুব ভালো। আমাকে শাসানোর কিছুক্ষণ পর সুযোগ বুঝে আমার কাছে এসে বলে, 'কিছু মনে করিস না। আমি আসলে তোর বুবুকে খুশি করার জন্য কথাগুলো বলেছি, তোকে কষ্ট দেবার জন্য বলি নি। রাগ করিস না আমার উপর ভাই।'

আমি বলি, 'এসব তো আমি জানিই দুলাভাই। তুমি চালিয়ে যাও, আমি তোমার সাথেই আছি।'

তারপর আমার কাছে আগ্রহ নিয়ে জানতে চায় আমার খাবার বন্ধ হবার কাহিনী। আমি সব খুলে বলার পর বলে, 'কাজটা করে দিলেই পারতি।' অথবা বলে, 'মেনে নিলেই পারতি। কেন যে মানুষটাকে ক্ষেপিয়ে দিস বুঝি না। কখন কি করতে হয় তুই এখনো শিখলি না।'

দুলাভাই খুব ভালো মানুষ বলে বুবুর সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে। কিন্তু আমি তো আর দুলাভাইয়ের মত ভালো মানুষ না।

বুবু যে কবিতাটা ছিড়ে ফেলেছিল সেটাই ছিল আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ কবিতা। নাম দিয়েছিলাম–*তোমার আমার ভালোবাসা*। খুব সুন্দর হয়েছিল, পাঠাতে পারলে মনে হয় ছাপাত। ঐ রাতে আবার ওটাকে লিখতে বসেছিলাম, কিন্তু লিখতে পারি নি। কারণ, অনেক লাইনই মনে পড়েছিল না। এরপর থেকে যেটুকু লিখতাম সেটুকুই মুখস্থ করে ফেলতাম।

এখন আমার ভান্ডারে কোনো পূর্ণাঙ্গ কবিতা নেই। কোনোটা দুই লাইনের কোনোটা তিন লাইনের আবার কোনো কোনোটা আট-দশ লাইনের। কিন্তু তবুও কবিতাগুলো পূর্ণ না। ঐ আট-দশ লাইনের অসম্পূর্ণ কবিতাগুলোই পত্রিকায় পাঠাই। মনে হয় এ জন্যই ওরা ছাপে না, আর আমিও আপসোস করি না। একবার নয় লাইনের একটা কবিতা বুকে সাহস নিয়ে পাঠালাম। চিঠি পোস্ট করে বাসায় আসতেই বুকের ভেতর ধক করে উঠল। কারণ, কবিতা ছাপার জন্য সম্পাদককে তেল দিয়ে যে চিঠিটা লিখতে হয় আমি সেটা লিখি নি এবং আমি কবিতার কোনো শিরোনামও দেই নি। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল–হলুদ খামের ভেতরে সাদা কাগজের উপরে নয় লাইনের একটা কিছু (অবশ্যই কবিতা নয়)। এই হল আমার কাব্যচর্চা।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আবার রাগও হচ্ছে। বরাবরের মত এবারও আমি দুই লাইনেই আটকে গেলাম। দুই লাইনের অনেক কবিতা আছে আমার। প্রতিবার এই দুই লাইনেই আটকে যাই। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত আর আমার দৌড় দুই লাইন পর্যন্ত! যেবার দুই লাইন পার করতে পারি সেবার লাাইন একটু বেশি হয়। আমার পূর্ণ কবিতাটা ছিল বাইশ লাইনের। এটাতে প্রথম ধাক্কায় সাত লাইন লিখেছিলাম। তাই আর আটকায় নি।

আজ রাগ একটু বেশি হচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন হল একটা ডায়েরি কিনেছি। ওটাতে সব কবিতা লিখে রাখব ঠিক করেছি। শিরোনামহীন দুই লাইনের কবিতাগুলো দেখতেই কেমন যেন লাগে। একটা পূর্ণ কবিতা দিয়ে ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠা উদ্ধোধন করব ভেবে রেখেছি। এ জন্যই আজ লিখতে বসা। কিন্তু আবার সেই দুই লাইন! উহ্, বিরক্ত!

আমি কবিতা লিখতে পারি না তবুও কেন যে লিখতে যাই নিজেই ভেবে পাই না। উপন্যাসে তবুও আঠারো পৃষ্ঠা লিখেছিলাম। তাই ঠিক করলাম আর কবিতার জন্য মাথা ঘামাবো না। এখন থেকে গল্প-উপন্যাস লিখবো।

আজ রাতে আর কিছু ভালো লাগছে না। রাতের নিস্তব্ধতাটাও না। ঘড়িতে পিক পিক করে শব্দ হল। দুটো বাজল। চোখে ঘুম নেই। একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে টেবিল থেকে উঠে ব্যালকুনিতে গেলাম। লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আজ জোছনা রাত! আমি খেয়ালই করি নি! মনটা ভালো হয়ে গেল সাথে সাথে। মন ভালো হলে লেখা ভালো হয়। একটু পরে ঘরে ফিরে গেলাম। আবার টেবিলে বসলাম। কাগজটা হাতে নিলাম। দুই লাইন কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে পড়তেই কেমন যেন অনুভূতি হল। লিখতে লাগলাম এবং কিছুক্ষণ পর দেখলাম বেশ কয়েক লাইন লিখে ফেলেছি :

যদি তুমি হারিয়ে যাও অজানা পথে,
তবে, কেমন করে খুঁজে পাবো তোমাকে?
যদি না থাকে জোছনার আলো,
যদি না থাকে আকাশে তারা,
আমি অমাবস্যার আঁধার ভরা রাতে,
কেমন করে খুঁজে পাবো তোমাকে?
তোমায় চেয়েছি আমি
ভালোবাসতে মনে-প্রাণে,
রাখতে চেয়েছি তোমায়

বুকের মাঝে খুব যতনে।

তবু যদি তুমি হারিয়ে যাও
আমায় কিছু না জানিয়ে,
আমি অনন্তকাল হেঁটে যাবো
দুর্গম পথে তোমারই খোঁজে।

আমি আবার সমস্যায় পড়ে গেলাম। কবিতাটাকে এই মুহূর্তে সম্পন্ন দাবি করা যাবে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি তা না করা যায় তাহলে ঠিক কোথায় গিয়ে শেষ করতে হবে বা ঠিক কিভাবে শেষ করতে হবে সেটাও বুঝতে পারছি না। মাথা ধরে গেল আমার। আমি ভালো করেই জানি, কবিতা লেখার জন্য যে রকম উর্বর মস্তিষ্ক প্রয়োজন হয় আমার মস্তিষ্ক মোটেও সে রকম নয়। তবুও মনকে আমি মানাতে পারি না, সুযোগ পেলেই কবিতা লিখতে বসে যাই।

মাঝে মাঝে একটা জিনিস ভেবে রবীন্দ্রনাথ দাদুকে আমার খুব সৌভাগ্যবান মনে হয়। ভাগ্যিস, আমি কবিতা লিখা শুরু করার অনেক আগেই উনি মারা গেছেন! আমি যে আমার এই কয়েক লাইনের লিখাগুলোকে কবিতা দাবি করছি, রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন এবং এই কথা শুনতেন তাহলে নির্ঘাত উনি গলায় দড়ি দিতেন! গলায় দড়ি দিয়ে মরার চেয়ে উনি যে স্বাভাবিকভাবে মারা যেতে পেরেছেন এইটাই বা কম সৌভাগ্যের কিসে!

নাহ্, আজ রাতে আর মাথা থেকে কিছু বের হবে না। শুধু আজ রাতে নয় সম্ভবত আর কোনদিনই এই কবিতা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। আমার কবিতা লেখার অতীত ইতিহাস অন্তত তাই বলে। এইমাত্র ঘড়িটা পিক পিক শব্দ করে তিনটা বাজার কথা আমাকে জানিয়ে দিল। এই মুহূর্তে আমার মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করে শব্দ হচ্ছে, তাই শুয়ে পড়া ছাড়া এখন আমার অন্য কিছু করার উপায় নাই।

সকালে (প্রায় বেলা এগারোটা) ঘুম থেকে উঠেই আমি বুঝতে পারলাম কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল পেকেছে। আমার ঘুম থেকে ওঠা দুই-তিন মিনিট হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে অন্তত তিন-চারবার আমার শোনার কথা–বুবু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বুয়াকে গালি দিচ্ছে। কিন্তু সেটা শুনতে পাচ্ছি না, এমনকি কোনো প্রকার শব্দও পাচ্ছি না। আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা, হিমেল আজ আমাকে একবারও বিরক্ত করতে আসে নি! সুতরাং, কিছু একটা যে গণ্ডগোল পেকেছে সে ব্যাপারে আমার আর কোনো সন্দেহ থাকল না। ঘুম থেকে ওঠার পর এরকম পরিস্থিতির মাঝে পড়তে হবে জানলে আজকে আমি ঘুম থেকেই উঠতাম না। কারণ, এরকম পরিস্থিতিতে ঝড়-ঝাপটা সবচেয়ে বেশি যার উপর দিয়ে যায়, সেই অধম ব্যক্তিটা হচ্ছে–আমি।

হাত-মুখ ধুয়ে অনেকটা ভয়ে ভয়েই আমি ডাইনিং টেবিলে গেলাম। আজ আগে থেকে প্যান্ট-শার্ট পড়ে নিয়েছি। কোনো কারণে যদি বুবুর এনকাউন্টারের মাঝে পড়ে যাই, বুবু নাগাল পাবার আগেই আমাকে চম্পট দিতে হবে। ফুটাফাটা স্যাণ্ডু গেঞ্জি আর লুঙ্গি পড়ে আর যাই হোক রাস্তায় যাওয়া ঠিক হবে না!

এই রকম পরিস্থিতির মাঝে আমাকে মাঝে মধ্যেই পড়তে হয়, তাই এই রকম সময়ে কি করতে হবে সে ব্যাপারে আমার বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। এই ব্যাপারে সম্ভবত আমার চেয়ে অভিজ্ঞ লোক এই গ্রহে আর পাওয়া যাবে না। আমি চুপি চুপি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। আমি যে রকম আশা করেছিলাম সে রকম আজ হল না। টেবিলে গ্লাস আর পানির জগ ছাড়া আর কিছুই নাই। বুবু টের পাওয়ার আগেই যে আমি নাস্তা করে পালাব, সে আর হল না।

আমার উপস্থিতি টের পেয়ে বুয়া পা টিপে টিপে প্রায় দৌড়ানোর মত অদ্ভুত ভঙ্গি করে ছুটে এসে ডান হাত দিয়ে দুইবার কপাল চাপড়ে ফিসফিস করে প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে আমাকে বলল, 'আপনে এইখানে বসে আছেন কি জন্যে?'

আমিও ফিসফিস করে বললাম, 'ঘটনা কি আগে সেইটা বল।'

বুয়া তার আর্তনাদের ভঙ্গি বজায় রেখে ফিসফিস করে বলল, 'ঘটনা খুবই গুরুতর। আপনে বাঁচতে চাইলে এক্ষুনি পালান।'

'একটু খুলে বল কি ঘটেছে?'

'কি ঘটেছে সেইটা শুনার ম্যালা টাইম পাইবেন, এখন জান বাঁচান। জান বাঁচানো হইল ফরজ কাম।' বুয়া হাঁপাতে লাগল।

'কিন্তু নাস্তা?'

'আরে বাবা, বাঁইচা থাকলে বহু নাস্তা পাইবেন। আপনের বুবু টের পাওনের আগেই তাড়াতাড়ি ভাগেন।' বুয়া কিছুটা উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল। তার মুখ থেকে একটু জোরে শব্দ বের হয়ে গেল, সাথে সাথে সে তার হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। আমি সাবধানে দরজা খুলে বের হয়ে এলাম।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করলাম বাসায় কি ঘটতে পারে। সবার আগে যে ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম তা হল, বুবু আর দুলাভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে এবং এই ঝগড়ার কেন্দ্রবিন্দু আমি। প্রথম বর্ষে এক সাবজেক্টে ফেল করার পর থেকে মাঝে মধ্যেই এই ব্যাপারটা ঘটে আসছে। গত কয়েকদিন থেকেই আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল–বুবু হুট করে আমার উপর ক্ষেপে যাবে, তারপর দুলাভাই আমাকে সমর্থন দিয়ে যখন বুবুকে শান্ত করার চেষ্টা করবে তখনই ঝগড়া বেঁধে যাবে। আমার গবেষণা বলছে আজ এই রকমই একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু, আমার গত কয়েকদিনের কোন আচরণটা বুবুকে ক্ষেপিয়ে দিল তা বের করতে পারছি না।

সম্ভবত এটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না–আমি দুলাভাইয়ের কামাই ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে খাই অথচ এ নিয়ে দুলাভাই আমাকে ইয়ারকি করেও কখনো খোঁচা দেয় নি। কিন্তু, বুবু এটা সহ্য করতে পারে না। সারাক্ষণ আমার সাথে খ্যাচ খ্যাচ করে, কথায় কথায় বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলে। এ রকম সময়ে দুলাভাই আমার হয়ে বুবুর সাথে ঝগড়া করে। ঝগড়ায় যদি বুবু হেরে যায় তাহলে আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অন্য যারা দুলাভাইয়ের কামাই ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে খায় তাদেরকে যদি আমি এই সব বলি তাহলে নির্ঘাত তারা আমাকে 'মাইর' লাগাবে। তাদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপরটা উল্টো! আমার মত সৌভাগ্য নিয়ে এই মহাবিশ্বে আর কয়জনের জন্ম হয়!

বুবুর এই আচরণ অবশ্য স্থায়ী হয় না। আজ কি ব্যাপারে আমাকে নিয়ে ঝগড়া হয়েছে সেটা জানা থাকলে আমি বের করে ফেলতে পারতাম কোন সময়ে বুবুর সামনে হাজির হলে আমার জন্য সেটা ঝুঁকিপূর্ণ না। অবশ্য সেই সময় বুবু যে আমাকে আদর করে কোলে বসিয়ে খাওয়াবে তা নয়, আমার উপর বুবু হামলা করে বসবে না শুধু এই ভরসা পাওয়া যেত। অতীত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে আমি অবশ্য বের করে ফেললাম–সন্ধ্যার আগে আমার বাসায় যাওয়া উচিত হবে না।

আমার বুবুটা অবশ্য এই রকম ছিল না। বাবা-মা মারা যাবার পর এই বুবুটাই আমাকে বুকে আগলে রাখত। আমি তখন খুব ছোট। পাঁচ-ছয় বছর মাত্র বয়স। প্রথমে মারা গেল মা। মাঝে মধ্যেই নাকি পেট ব্যথা হত মায়ের। কেউ তেমন গুরুত্ব দিত না। এক সময় যখন সেটা সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেল তখন ডাক্তার দেখানো হল। ডাক্তার বলল ক্যান্সার হয়েছে। দুই মাসের মধ্যেই নাকি মারা গেল মা।

মা মারা যাবার পর বাবা খুব ভেঙ্গে পড়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে বাবা ভেউ ভেউ করে কাঁদত। আমি তখন অবাক হয়ে দেখতাম। আমি তখন পর্যন্ত কোনো বড় মানুষকে

কাঁদতে দেখি নি। বাবাকেই প্রথম দেখেছিলাম, তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আমি অনেককে তখন বলতে শুনেছি বাবা ঢং করে কাঁদছে। দুদিন পরেই নাকি আরেকটা বিয়ে করে আনবে। কথাটা সত্যি হয় নি। মা মারা যাওয়া এক মাসও হয় নি বাবা হুট করে একদিন আমাদেরকে টা টা জানিয়ে চলে গেলেন। রাতে ঘুমিয়ে আর ওঠেন নি। ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন বাবা।

আমার স্পষ্ট মনে আছে বুবু সেদিন খুব কাঁদছিল। মানুষ মারা গেলে যে খুব কাঁদতে হয় সেটা আমি তখনো শিখি নি। কিন্তু আমার মনে আছে, বুবুর দেখাদেখি আমিও ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলাম। অনেক কান্নাকাটি করে চোখ লাল টকটকে করে ফেলে আমি বাবার জানাযার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে মায়ের জানাযার নামাজে আমি ভুল করে ফেলেছিলাম। আমি তখন নামাজ বলতে শুধু জানতাম হুজুর আল্লাহু আকবার বলবে আর আমরা রুকু-সেজদাহ্ দিব। জানাযার নামাজ যে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, রুকু-সেজদাহ্ দেয়া লাগে না সেটা আমাকে কেউ বলে দেয় নি। তাই মায়ের জানাযার নামাজে হুজুর যখন প্রথমবার আল্লাহু আকবার বলল তখন আমি হাত বাঁধলাম, দ্বিতীয়বার রুকুতে গেলাম, তৃতীয়বার উঠে দাঁড়ালাম, পরের বার সেজদাহ্ দিলাম এবং তারপরের বার উঠে বসলাম। হঠাৎ করে লক্ষ করলাম আমি ছাড়া এই কাজ আর কেউ করছে না। তখন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। না বুঝেই নামাজের পরের অংশটুকু শেষ করলাম। নামাজ শেষে ছোট চাচা বলে দিল জানাযার নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, রুকু-সেজদাহ্ দিতে হয় না।

বাবার জানাযার নামাজে আমি আর ভুল করি নি। মায়ের দাফন করা আমি দেখি নি, কিন্তু বাবারটা দেখেছিলাম। একটা সাদা কাপড়ে বাবাকে পেঁচিয়ে বিরাট একটা গর্তের মাঝে রেখে মাটি চাপা দেয়া হল। এসব কেন করতে হয় আমি তখনো জানতাম না। তাই শুধু হা করে দেখা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না।

বাবা-মা মারা যাবার পর আমি আর বুবু ছোট চাচার কাছে থাকতাম। প্রথম কয়েকদিন ছোট চাচি আমাদের খুব আদর করত। মাস খানেক পর উনি তাঁর আসল চেহারা আমাদের দেখালেন। চাচির অত্যাচার অবশ্য আমাকে এতটুকু স্পর্শ করত না, সব যেত বুবুর উপর দিয়ে। আমার স্পষ্ট মনে আছে রাতে ঘুমানোর সময় বুবু আমাকে বুকে চেপে রাখত আর কাঁদত। আমি যে কেন তখন ছোট ছিলাম সেটা ভেবে মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। আমি যদি তখন একটুও বড় থাকতাম তাহলে চাচির টুঁটি টেনে একেবারে ছিঁড়ে ফেলতাম।

চাচা অবশ্য খারাপ ব্যবহার করত না। আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাকে খুব আদর করত। চাচারও একটা ছেলে একটা মেয়ে। তাদের চেয়েও আমাকে বেশি আদর করত। আর এটা দেখে চাচি রোজ চাচার সাথে ঝগড়া করত। মাঝে মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত–আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। চাচার কারণে সেটা পারে নি। এজন্য চাচাকে আমি খুব পছন্দ করতাম।

কিন্তু কে জানত এই চাচা জানোয়ার টাইপের একটা মানুষ! বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে মানুষ করছে! তার প্রথম উদ্দেশ্য আমাদের সম্পত্তি এবং দ্বিতীয় আমার বুবু।

বুবু তখন কলেজে পড়ে, আর আমি ক্লাস ফোরে। একদিন চাচি আর চাচাতো ভাইবোনেরা বাসায় ছিল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আর চাচা টিভি দেখছিলাম। পাশের ঘরে ছিল বুবু। টিভি দেখতে দেখতে এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন পাশের ঘর থেকে বেশ জোরে কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ পেলাম, সাথে বুবুর কান্নার শব্দ। আমি চমকে উঠেছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। যখন আমি বিছানায় উঠে বসেছি তখন পাশের ঘর থেকে বুবু বেরিয়ে বাইরে দৌড় দিল। কয়েক সেকেণ্ড পর চাচা বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে। আমাকে দেখে একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল চাচা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'চাচা, কি হয়েছে?'

চাচা আমার কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'তেমন কিছু হয় নি সোনা, তোমার বুবু তেলাপোকা দেখে একটু ভয় পেয়েছে।'

আমি অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম যে, বুবু ঐ দিন তেলাপোকা দেখে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু যখন বড় হলাম, সবকিছু বুঝতে শিখলাম তখন বুঝেছি ঐ দিন আসলে কি ঘটেছিল।

আমি প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না, পরে বুঝেছি বুবুর এরকম বদলে যাওয়া, হিংস্র হয়ে যাওয়ার পেছনে ঐ দিনের ঘটনা জড়িত। আমার সাথে অবশ্য তেমন একটা হিংস্র আচরণ করে নি বুবু। তবে, যতটুকু করেছে ততটুকু আমার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে বুবুকে আমি ভয় পেতে লাগলাম এবং লক্ষ্য করলাম বুবু আমাকে আর আদর করছে না।

চাচা-চাচি জোর করে বুবুকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করল। বুবু প্রথম প্রথম বিয়ে করতে চাইত না। সম্ভবত বুবুকে চোর চামারের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়া হতে পারে এই ভয়ে। পরে একদিন বুবু বিয়েতে রাজি হল। বুবু যে এত বড় সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে সেটা জানা থাকলে সম্ভবত চাচা-চাচি বুবুকে বিয়ের ব্যাপারে এত তোড়জোড় করত না। দুলাভাইয়ের মত ভালো মানুষের সাথে বিয়ে হবার জন্য ভাগ্য লাগে!

বুবুর বিয়ের দিনটা আমার জন্য খুব কষ্টের ছিল। আমি ভেবেছিলাম যাবার সময় বুবু আমাকে সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম বুবু আমাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছে না, আমার দিকে তাকাচ্ছে পর্যন্ত না। আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছিলাম।

সেদিন রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি নি। আমি একদমই বিশ্বাস করতে পাছিলাম না যে, আমি বুবুকে ছাড়া ঘুমাচ্ছি। জন্মের পর সেদিনই প্রথম আমি একা একা রাত কাটিয়েছি। আমার বারবার মনে হচ্ছিল বুবু শ্বশুর বাড়ি গিয়ে যখন দেখবে আমি সেখানে নাই তখন আমার কাছে ছুটে আসবে, আমাকে বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদবে, তারপর আমকে সাথে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম কিছু হল না। আমাকে একাই রাত কাটাতে হল। এবং মেনে নিলাম আমাকে এখন থেকে একাই ঘুমাতে হবে, কেউ আমাকে ঘুম পাড়াতে আসবে না।

বুবুর সাথে যখন বিয়ে হয় তখন দুলাভাইয়ে কোনো চাকরি ছিল না। বিয়ের কয়েকদিন পর হুট করে একটা চাকরি পেয়ে গেল। চাকরি করতে ঢাকায় চলে যেতে হবে। চাচা খবরটা যখন চাচিকে দিচ্ছিল তখন শুনে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। বুবু আরো দূরে চলে যাবে আমার কাছ থেকে। তবে, মেনে নিতে পেরেছিলাম। কারণ বিয়ের পর যে দুইবার বুবু আমার কাছে এসেছিল সে দুইবার আমার সাথে তেমন কথা বলে নি। শুধু আমি দুষ্টুমি করছি কিনা, পড়াশোনা করছি কিনা এসব জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু চাচি আমাকে ভালোভাবে খেতে দিচ্ছে কিনা, কোনো খারাপ ব্যবহার করছে কিনা এসব জিজ্ঞেস করে নি। আর আমাকে সাথে নিয়ে যাবে কিনা সেটাও বলেনি। সুতরাং, বুবু কাছে থাকলেই কি আর দূরে থাকলেই বা কি আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না।

কিন্তু কে জানত, বুবু-দুলাভাইয়ের সাথে আমিও ঢাকায় চলে আসব, বুবুর সাথে থাকব, ঢাকার বড় বড় স্কুল-কলেজে পড়ব, ঠিক মত খেতে পাব! তাহলে কি আর সেদিন মন খারাপ করি!

সেই থেকে আমি এখনো দুলাভাইয়ের হোটেলে আছি এবং বেশ ভালোই আছি। তবে, ঐ ঘটনার পর বুবু অনেক বদলে গেলেও আমার প্রতি এতটা নির্দয় ছিল না। বর্তমানে আমার প্রতি এতটা নির্দয় হবার পেছনে মূল কারণ আমার উল্টোপাল্টা আচরণ এবং প্রথম বর্ষে এক সাবেজেক্টে ফেল।

আমার উল্টোপাল্টা আচরণগুলোর মধ্যে বুবুর সবচেয়ে খারাপ লাগে–কবিতা লেখা আর ঘুমোনো। এরপরই আছে পড়াশোনা না করা আর টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়নো। এখানে মজার ব্যাপার হল আমি ২৪ ঘন্টায় এই কয়টা কাজের বাইরে আর কিছুই করি না। অর্থাৎ আমি ২৪ ঘন্টায় যা করি তার সবই বুবুর অপছন্দ!

আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মধ্যে আমার কবিতা লেখা প্রসঙ্গে আমাকে সাহস দিয়ে বলে, 'চালিয়ে যা দোস্ত, তুই একদিন অনেক বড় কবি হবি।'

আমার টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন-অসহায়ত্ব দেখা নিয়ে ওরা বলে, 'দোস্ত, তুই এক্কেরে কারেক্ট কাজটাই করছিস। তুই যে এভাবে ঘুরে বেরিয়ে গরিব মানুষের জীবন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে রাখছিস, কখনো যদি রাজনীতি করতে যাস তাহলে তোর অনেক সুবিধা হবে। দেশের আসল সমস্যাটা কোথায় তুই আগেই জেনে থাকবি, তাই আসল কাজটাই করতে পারবি। দেখবি, বঙ্গবন্ধুর মত তুইও একদিন অনেক বড় নেতা হয়ে যাবি।'

আমার ঘুমানো নিয়েও ওরা ফাটাফাটি মন্তব্য করে, 'দোস্ত, পৃথিবীতে যত বড়লোক মানুষ আছে তাদের সবারই মেইন সমস্যা ঠিকমত ঘুম হয় না। তুই যেভাবে ঘুমানোটাকে শিল্পে পরিণত করেছিস তাতে এটা যদি গণমাধ্যমে প্রচার করা যায় তবে দেখবি ঐ সব বড়লোক মানুষ তোর পিছে লাইন দিয়েছে। তুই তখন উনাদেরকে ঘুম বিষয়ক টিপস দিয়ে কিছু কামিয়ে নিতে পারবি আর দেখবি তুই রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছিস! দোস্ত, এই টিপসের জন্য কিন্তু আমাকে টেন পার্সেন্ট দিতে হবে!'

এগুলোর সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে আমার ফেল করা। কখনো পড়াশোনা ভালো করে না করলেও ফেল করি নি। এই প্রথম ফেল করলাম। এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে আমিই একমাত্র ফেল্টুস স্টুডেন্ট। ওরা ফেল করার ব্যাপারে আমাকে আরো উৎসাহিত করে বলে, 'শোন দোস্ত, ফেল করা নিয়ে তুই মোটেও মন খারাপ করিস না। পৃথিবী এখন যে দিকে ঘুরছে, ধর্ কোনোদিন তার উল্টোদিকে ঘোরা শুরু করল, তখন দেখবি পৃথিবীর সব নিয়ম উল্টো হয়ে যাবে। তোর ফেল তখন হয়ে যাবে ফার্স্ট ক্লাস আর আমাদের ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যাবে ফেল। সো দোস্ত, তুই যত খুশি ফেল করে যা আর পৃথিবী উল্টো ভাবে ঘোরার অপেক্ষায় থাক।'

আমি জানি ওরা সবাই এই সব ইয়ারকি করে বলে। তবুও তো বলে, কিন্তু বুবু একদিনও ইয়ারকি করেও ভালো কিছু বলে নি। সারাক্ষণ খ্যাচ খ্যাচ করে বলে, 'এখনো সময় আছে সজল, সোজা হ।' মাঝে মাঝে হুশিয়ারি দিয়ে বলে, 'ভালোই ভালোই বলছি সজল, সোজা হয়ে যা। না হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব।'

বুবু যতই হুশিয়ারি দিক, উল্টোপাল্টা জীবন-যাপন ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই। অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, এভাবে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পাই নি।

আমি আগে এরকম উল্টোপাল্টা ছিলাম না। একটা ঘটনা আমাকে উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে। ঘটনার শুরু একটা নাটক দিয়ে। আমি তখন কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ি। আমরা যে কয়জন একসাথে থাকি তারা ঠিক করলাম একটা নাটক করব। নাটকটা হবে রোমান্টিক। সবাই মিলে কাজ শুরুও করে দেয়া হল। সিনিয়র ভাইদেরকে জানানো হল। সিনিয়র ভাইয়ারা পারলে ঐ দিনই করে। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না। নাটকের মধ্যে একটা শিল্প আছে, এটাকে যত্ন করে করতে হয়।

একে একে সিনিয়র আপু এবং আমাদের ইয়ারের মেয়েরা যোগ দিল। অনেকেই অভিনয় করতে চাইল, তখন অডিশনের ব্যবস্থা করা হল। অডিশনের মূল বিষয় হল–ভালো চেহারা আর ভালো অভিনয়। কিন্তু এই দুটো এক সঙ্গেই থাকতে হবে সেই নিয়ম নেই। অভিনয় না জানলেও শুধু ভালো চেহারা হলেই অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। তাবে, অভিনয় করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আমি ভালো চেহারা এবং অভিনয়ের অভিজ্ঞতার জোরে নায়কের রোল পেয়ে গেলাম। শুনেতো আমার আক্কেল গুড়ুম। আমি স্কুলে যে কয়টা নাটকে অভিনয় করেছি সেগুলোতে সবচেয়ে ছোট রোলটাই আমাকে দেয়া হত। অথচ এখানে আমাকে দেয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় রোল। আমি অভিনয়ই করতে চাইছিলাম না। কিন্তু যখন জানলাম নাটকের একটা দৃশ্যে নায়িকাকে জড়িয়ে ধরার দৃশ্য আছে তখন আর না করে কে! তখন তো আমার বন্ধুরা

আমাকে পটাতে লাগল। কেউ বলল, 'দেখ দোস্ত, এই পঁচা নাটকে অভিনয় করে অযথা চরিত্র নষ্ট করিস না। নাটক থেকে সরে যা।'

একজন তো একেবারে ফাটাফাটি একটা অফার দিয়ে বসল। আমি যদি নায়কের চরিত্র থেকে সরে তাকে জায়গা করে দেই তাহলে সে তার গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে আমাকে পুরো একদিন ডেটিং করার সুযোগ করে দেবে। কিন্তু, আমি রাজি হই নি। অন্যের গার্ল ফ্রেন্ডকে নিয়ে পুরোদিন ডেটিং করার চেয়ে একটা মেয়েকে কিছুক্ষণের জন্য জড়িয়ে ধরা লক্ষ কোটিগুণ ভালো!

নায়িকার মুখ দেখেই আমি ভেতরে অন্য রকম বল পেয়ে গেলাম।। আমি যদি ভালো না পারি তহলে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নেয়া হবে। তার উপর আবার আমার শত্রুর অভাব নাই। তখন সারাজীবন আমাকে পস্তাতে হবে। শুধু এইটুকু ভাবনাই আমাকে ফাটাফাটি অভিনয় করিয়ে দিল। আর সেই মুহূর্তটা, সেই মুহূর্তটা আমি কোনোদিন ভুলব না।

নাটকের পর থেকে আমার জীবনটাই বদলে গেল। নায়িকার সাথে আমার খুব ভাব জমলো। আমার অভিনয় নাকি তার খুব ভালো লেগেছে। প্রতিদিন আমরা অনেকক্ষণ একসাথে বসে গল্প করতাম, কত যে মজার গল্প করতাম! মাঝে মাঝে কোথাও ঘুরতে যেতাম, বাদাম চিবাতাম, আরো কত মজা যে করতাম!

দিনে দিনে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হলাম। আর আমার বন্ধুরা সেটা দেখে হিংসায় মরে যেতে লাগল! ওকে দেখলেই আমার বুকের ভেতর কোথায় যেন কি একটা নড়েচড়ে উঠত। কিন্তু এই অনুভুতির কথা ওকে জানাতে পারতাম না। ভাবতাম, এই কথা বলা মাত্রই যদি ও আমাকে ভুল বুঝে চলে যায়! কারণ ওর দিক থেকে আমি কখনো কোনো ইঙ্গিত পাই নি।

আমার ব্যাপারটা এক সময় এমন হয়ে গেল যে, ওকে একদিন না দেখলে আমি থাকতে পারতাম না, ওর কথা না শুনলে ঘুম আসতে চাইত না। সেও আমাকে মিস করত। সেই নাটকের নায়িকা হয়ে গেল আমার মনের নায়িকা, প্রাণের নায়িকা। শুধু এই কথাটুকু ওকে জানাতে পারতাম না।

সময়ের ব্যবধানে ওর সাথে আমার যোগাযোগ কমতে থাকল। রোজ আর দেখা হত না। আমি অস্থির হয়ে উঠতাম কিন্তু দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যেত!

এইচ.এস.সি. ফাইনালের মাস খানেক আগে এক রাতে নায়িকা আমাকে ফোন করল। রাত তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। আমি ফোন রিসিভ করে বললাম, 'হ্যালো, খবর কি নায়িকা? অনেকদিন ধরে দেখা সাক্ষাত নাই, ফোন করা নাই, হঠাৎ হারিয়ে গেলে যে?'

নায়িকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাতর গলায় বলল, 'সজল, তুমি কি এখন একটু আসতে পারবে?'

নায়িকার গলা শুনে আমি চমকে উঠলাম, বিচলিত হয়ে বললাম, 'কোথায়?'

'কলেজ গেটে।' আবারো কাতর কণ্ঠ।

আমি আরো বিচলিত হয়ে বললাম, 'কেন? কি হয়েছে?'

'আমি এখন কিছু বলতে পারব না। তুমি একটু আসো।' এবার নায়িকা আমার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলল।

আমার হৃৎপিণ্ড পিং পং বলের মত লাফালাফি শুরু করে দিল, আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'তুমি এখন কোথায়?'

'কলেজ গেটে।'

আমার প্রায় হার্টফেল করার মত অবস্থা! রাত সাড়ে এগারোটার সময় আমার নায়িকা ওখানে কি করছে! আমি কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এত রাতে তুমি ওখানে কেন? কি করছ তুমি ওখানে?'

'আমাকে এখন কোনো প্রশ্ন করো না, প্লিজ তুমি একটু আসো, আমার খুব ভয় করছে।' নায়িকা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

আমার নায়িকা কাঁদছে এটা কি আমার সহ্য হয়? আমি দিলাম ছুট। কি বুবু কি দুলাভাই কেউ আমাকে ডেকে পেল না। আমি না নিলাম রিক্সা না নিলাম আমার সবচেয়ে বিরক্তিকর দুই চাক্কার যান। রাত সাড়ে এগারোটার সময় আমি দৌড় দিলাম শহরের রাস্তায়।

প্রায় বিশ মিনিট পর আমি পৌঁছালাম কলেজ গেটে। আমি আসার সময় ভেবেছিলাম নায়িকা আমাকে বোকা বানানোর জন্য বোধ হয় অভিনয় করছে। কিন্তু এসে দেখলাম ব্যাপারটা সত্যি না। সত্যি সত্যি দেখি আমার নায়িকা গেট থেকে একটু পাশে সরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে লাগল।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এত রাতে এখানে কি করছ?'

নায়িকা কোনো উত্তর দিল না, আরো জোরে কাঁদতে লাগল।

আমি আবার বললাম, 'এখন এভাবে কেঁদোনা। কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো।'

নায়িকা তবুও কোনো কথা বলল না।

আমি এবার বিচলিত হয়ে বললাম, 'শোনো, এখন রাত বারোটা বাজে। কি হয়েছে সব খুলে বলো। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, না হলে তোমার আমার দুইজনেরই সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবার নায়িকা কথা বলল, 'আমার সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।' এটুকু বলেই নায়িকা থেমে গেল।

আমি বললাম, 'কি হয়েছে সেইটা আমাকে বলো?'

'আমি কিছু বলতে পারব না।' বলেই আবার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে লাগল।

আমি এবার রেগে গেলাম, বললাম, 'তুমি বলবে না তো কে বলবে? এখানে কি আর কেউ আছে না আর কেউ আমাকে ডেকে এনেছে?

নায়িকা আরো জোরে কেঁদে ফেলল। আমি একটু শান্ত হয়ে নায়িকার হাত ধরে বললাম, 'প্লিজ, বলো কি হয়েছে?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নায়িকা সব খুলে বলল। ওর কথা শোনার পর আমার নিজের অনুভুতি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। নায়িকা একজনকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসা ওর বাবা-মা কোনোদিন মেনে নেবে না, মরে গেলেও না। তাই সে ছেলেটার সাথে পালিয়ে যাবে ঠিক করেছিল। বিকেলে সে মাকে কোচিং যাবার কথা বলে বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সন্ধ্যার সময় নায়িকার ভালোবাসার পাত্রটা তাকে একটা ফাঁকা বাসায় নিয়ে যায়। অগাধ বিশ্বাসে নায়িকা সেই ফাঁকা বাসায় তার ভালোবাসার পাত্রটার সাথে সময় কাটায়। এক পর্যায়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার নারীত্বের মূল অবলম্বন হরিত হয়। তারপর নায়িকাকে সেই বাসায় রেখেই ভালোবাসার পাত্রটা চলে যায়।

আমি অবলীলায় নায়িকাকে প্রশ্ন করতে পারতাম, যে ভালোবাসা বাবা-মা মেনে নেবে না সে ভালোবাসা করার কি দরকার? সে এত ভালো ছাত্রী, শিক্ষিত একটা মেয়ে, সে যদি এই ভুল করে তবে গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের অবস্থা কি হবে? ভালোবাসতে তো কোনো দোষ নাই; কিন্তু তাই বলে একটা শিক্ষিত, মেধাবী মেয়ে একটা বাসের হেলপারকে ভালোবাসবে! বাসা থেকে পালিয়ে আসবে! নিজের সতীত্ব হরণের সুযোগ করে দেবে!

নায়িকা যাকে ভালোবাসে সে আসলেই একটা বাসের হেলপার। সব জেনে শুনেই নায়িকা তাকে ভালোবেসেছিল। ভালোবাসা কোনো ব্যবধান মানে না জানি, কিন্তু বর্তমান যুগে সম্ভব-অসম্ভব বলে ব্যাপারটা তো আছে? কোন মেয়ের বাবা-মা চায় তার শিক্ষিত মেয়েকে হেলপারের হাতে তুলে দিতে? নায়িকা যখন মা হবে তখন কি সে পারবে তার শিক্ষিত মেয়েকে হেলপারের হাতে, মুচির হাতে তুলে দিতে? পারবে না। অথচ বয়ঃসন্ধির উন্মাদনার সে এত বড় ভুল করে ফেলেছে।

নায়িকাকে আমি কোনো প্রশ্ন করতে পারলাম না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, সে ঐ হেলপারের মাঝে কি পেয়েছিল? কোন বিশ্বাসে, কিসের টানে, কিসের আশায়

ভালোবেসেছিল? কিসের ভরসায় বাসা থেকে পালিয়ে এসেছিল, ফাঁকা বাসায় সময় কাটিয়েছিল? কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'এখন তুমি কি করবে?'

নায়িকা উত্তর দিল, 'জানি না।'

আমার খুব রেগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রাগতে পারলাম না, বললাম, 'তাহলে কে জানবে?'

নায়িকা উত্তর দিল না। চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

আমি নায়িকাকে বললাম, 'তুমি দুইটার যে কোনো একটা বেছে নিতে পারো। এক–তুমি আত্মহত্যা করতে পারো আর দুই–তুমি বাসায় ফিরে যেতে পারো। জীবন তোমার তুমিই ঠিক করো কি করবে।'

নায়িকা একটু ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কেঁদে উঠল, কোনো উত্তর দিল না। আমি তার হাত ধরে বললাম, 'চলো, তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি।'

নায়িকা একটু সময় নিয়ে দাঁত-মুখ শক্ত করে বলল, 'আমি এখন বাসায় ফিরে যেতে পারব না।'

'তাহলে কি করবে?'

সে দাঁত-মুখ শক্ত করেই বলল, 'আত্মহত্যা।'

আমি নিজের অনুভূতি, আবেগ হারিয়ে ফেলেছি, তাই নায়িকার কথায় বিচলিত হতে পারলাম না। আমি তার হাত ধরে বললাম, 'আত্মহত্যা করলেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যায় না। বরং সমস্যা আরো গভীর হয়। চলো, বাসায় যাবে।'

নায়িকা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি এভাবে এখন এই মুখ নিয়ে কিভাবে বাসায় যাবো? আমি বাসায় যেতে পারব না। তুমি আমাকে একটু বিষ এনে দাও। আমি বাঁচতে চাই না।'

আমি রূঢ় হাসি দিয়ে বললাম, 'তোমার কাছে বিষ বিক্রি করার জন্য এত রাতে কোনো দোকান খোলা নেই। আর আমি থাকতে তোমার আত্মহত্যা করার সাধ্য নেই। পাগলামি না করে বাসায় চলো। রাত বেড়ে যাচ্ছে।'

নায়িকা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আব্বু আমাকে বাসায় ঢুকতে দেবে না, আমি বাসায় যেতে পারব না।'

আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, তবুও রাগতে পারছি না। তারপরও একটু রাগ রাগ ভাব নিয়ে বললাম, 'এখন এভাবে কাঁদছ কেন? প্রেম করার আগে হুঁশ ছিল না, পালিয়ে আসার আগে, সতীত্ব হারানো আগে হুঁশ ছিল না? আব্বু বাসায় ঢুকতে দিক আর নাই দিক তোমাকে এখন বাসাতেই যেতে হবে।'

আমি নায়িকার হাত ধরে টান দিলাম, বললাম, 'আর কোনো কথা না। এখন সোজা বাসায় চলো।'

নায়িকা তবুও আসতে চাইছিল না। আমি মোটামুটি জোর করে ওকে বাসায় নিয়ে গেলাম। ওর কথাই সত্যি, আব্বু ওকে বাসায় ঢুকতে দিতে চাইছিল না। আর আমাকে তো পারলে খুন করে! ওর আব্বু বুঝতে ভুল করেছিল, ভেবেছিল আমিই সেই কুলাঙ্গার যে তার মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাসা থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল। যখন ভুল ভাঙল তখন আমার সামনেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল মধ্যবয়সী পুরুষ মানুষটা! আর তাই দেখে নায়িকার আম্মাও হু হু করে কেঁদে উঠল। আমারও চোখ ছলছল করে উঠল।

আমি উনাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে রেখে আসলাম। আর নায়িকার দিকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে বললাম যাতে সে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসতে না পারে। সে যে আত্মহত্যা করবে ঠিক করেছিল সেটাও বলে দিলাম। এসব কথা যখন বলছিলাম তখন মনে হচ্ছিল আমিই বুঝি পরিবারটির অভিভাবক আর ওরা সবাই বাচ্চাকাচ্চা!

আমার নায়িকা অবশ্য অআত্মহত্যা করে নি। তবে বর্তমানে সে যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে ঐ দিন আত্মহত্যা করাই ভালো ছিল।

ঐ রাতের কয়েকদিন পর ছেলেটা নায়িকার বাসায় হাজির। একা নয়, একেবারে দলবল নিয়ে। তারা নায়িকার বাবার কাছে দাবি করে ছেলেটির সাথে নায়িকার বিয়ে দেয়ার। নায়িকার বাবা পারলে তাদের গুলি করে মারে! প্রচণ্ড হাঙ্গামা বেঁধে যায়। কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয় না নায়িকা। নায়িকা নিজেই ছেলেটাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। তারপর ঐ বখাটের সাথে বিয়ে হয়ে যায় নায়িকার।

কেন সেই রাতে ছেলেটা নায়িকাকে ধোকা দিল আর কেনইবা আবার দলবল নিয়ে হাজির হল এই হিসাবটা আমি মেলাতে পারি না। আর নায়িকা কেন এইটা মেনে নিল, কেন ঐ কুচরিত্রের হেলপারকে বিয়ে করে ফেলল এই হিসাবও আমি মেলাতে পারি না।

এখন সে কেমন আছে সেটা আর না বলাই ভালো। সে কেন এই কাজটা করল–প্রশ্নটা মাঝে মধ্যেই আমার ভেতরে জেগে ওঠে। সে কি ছেলেটাকে বিয়ে করে কোনো প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল? কিন্তু তাতে তার লাভ কি? সে তো সুখী হতে পারল না। সে এখন বেঁচে থেকেও মৃত একটা প্রাণ!

ঐ রাতের পর নায়িকার সাথে আমার আর কথা হয় নি। ফোন করলে সে কেটে দিত। আমিও ওদের বাসায় গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতে পারি নি। অন্যদের কাছ থেকে শুধু বাইরের ঘটনাগুলো শুনেছি, ভেতরের ঘটনা জানতে পারি নি। আসলে জানতে তেমন ইচ্ছেও করে নি। তাই এ ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা হয় নি।

সেই থেকে আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল। আমি এখন কবিতা লিখে সুখ খোঁজার চেষ্টা করি, টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেরিয়ে গরিব-অসহায় মানুষদের অসহায়ত্ব দেখে বোঝার চেষ্টা করি কে বেশি অসহায়? আমি, নায়িকা নাকি ওরা? যতক্ষণ পারি ঘুমিয়ে থাকার চেষ্টা করি, কারণ যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি ততক্ষণ এসব হতাশা-দুঃখ তাড়া করে না। এভাবেই আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। আমার প্রতিটা দিন আসলে একটাই দিন, ভিন্ন ভিন্ন দিন নয়।

যে নাটকটিকে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের উপলক্ষ ভেবেছিলাম সেই নাটক আমার জীবনটাকে এলোমেলো করে দেয়ার উপলক্ষ হয়ে গেল। আমি নায়িকাকে পাই নি বলে নয়। সে যদি সুখে থাকত, সে যদি যোগ্য একটা ছেলেকে বেছে নিত তবে হয়তো আমার এই অবস্থা হত না। আমি তো তাকে না পাওয়ার জ্বালায় পুড়ি না, আমি পুড়ি তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তার সুন্দর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তছনছ হয়ে যাওয়ায়।

আমি কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারি না–একটা শিক্ষিত মেয়ে, একটা সুন্দরী, মেধাবী মেয়ে কেমন করে এত বড় ভুল করতে পারে! একটা বাসের হেলপারের মাঝে কি খুঁজে পায়...

[এই গল্পের খুব ছোট একটি অংশ যার জীবন থেকে নেয়া, সে যদি সেটা ধরে ফেলে তবে তার কাছে আমি ক্ষামাপ্রার্থী। আর যদি সে ধরতে না পারে তবে সেটা আমার সৌভাগ্য!]

স্বপ্নলোকে শোকের হানা

কয়েকদিন থেকে খুব শীত পড়েছে। অনেক বেলা পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যায় না, আবার বেলা শেষ না হতেই কুয়াশার চাদর বিছাতে থাকে। গত কয়েকদিন থেকে টানা শৈত্য প্রবাহ চলছে। সাধারণ জীবন প্রায় বিপন্ন। মানুষ একটুখানি উষ্ণতার জন্য উন্মুখ। সুযোগ পেলেই আগুন জ্বালিয়ে নিজেকে উষ্ণ করে নেয়ার চেষ্টা চলছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে গরিব মানুষের যাদের গরম কাপড়ের অভাব।

রহিমুদ্দি গায়ের পাতলা চাদরটা আরো ভালোভাবে গায়ের সাথে জড়িয়ে নিচ্ছে। তার তলে কোনো সোয়েটার নেই। যে দুই-তিনটা তার ছেঁড়া-ফাটা জামা গেঞ্জি আছে সব এক সাথে পড়েছে, তবুও যেন শীত তাকে আরো জোরে চেপে ধরতে চাইছে। এইমাত্র একটা খ্যাপ মেরে পঁচিশ টাকা পেয়েছে মফস্বল শহরের ভ্যান চালক রহিমুদ্দি। বয়স ষাটের উপরে। এখনো তাকে ভ্যান চালিয়ে খেতে হয়। একে বয়সের ভার তার উপর এ রকম হাড় কাঁপানো শীত, একটা খ্যাপ মেরেই কেমন যেন ক্লান্তির ভাব চলে আসে। প্রথম খ্যাপে পঁচিশ টাকা। মহাজনকে দিতে হলে আরো পনেরো টাকা দরকার। তারপর যা থাকবে তা নিজের। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে সে আর পারবে না। এমনিতেই শীতের দিনে বের হতে দেরি হয়, খ্যাপ পেতে আরো দেরি হয়। তার উপর শরীর খারাপের জন্য আজ বের হতে আরো দেরি হয়েছে। এর মধ্যে একটা খ্যাপ মেরেই রহিমুদ্দি কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। আসলে ভ্যান চালাতে তার এমন কিছু কষ্ট হয় না। সেই বারো বছর বয়স থেকেই রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে অভ্যাস। সে হাঁপিয়ে উঠেছে শীতের কাঁপুনিতে।

রহিমুদ্দি পঁচিশ টাকা থেকে দেড় টাকায় লাল চা আর আটানার বিড়ি কিনবে কিনা ভাবছিল ঠিক সে সময় সে আরো একটি খ্যাপ পেয়ে গেল। খ্যাপটা মেরে এসে এবার আর ভাবল না রহিমুদ্দি। ভ্যানে তালা লাগিয়ে পাশের বাবুল মিয়ার দোকানে চা খেতে গেল। আপাতত প্রথম চিন্তা দূর হয়েছে। মহাজনের চল্লিশ টাকা হয়ে গেছে। এবার সে দুইটা টাকা খরচ করতে পারে।

বাবুল মিয়াকে চায়ের কথা বলে রহিমুদ্দি বেঞ্চের উপর পা তুলে জড়োসড়ো হয়ে বসল। সামনের বেঞ্চে তার মত একজন বুড়ো ছাড়া আর কেউ নেই। বুড়ো মানুষটিও চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। বুড়ো মানুষটির দিকে তাকিয়ে রহিমুদ্দি বলল, 'যা জাড় পড়ছেরে ভাই, শরীলডা মনে হয় বরফের লাহান জইম্মা যাইবো।'

রহিমুদ্দি মানুষটিকে চেনে না। মানুষটিও রহিমুদ্দিকে চেনে না। কিন্তু এরকম কথা-বার্তায় চেনা-পরিচয়ের দরকার পড়ে না। তাই বুড়ো মানুষটি জবাবে বলল, 'ভাইরে, কুনো মতন যে বাইচ্চা আছি এইডাই ম্যালা। এইতো দুইদিন আগে আমার পাশের ঘরের সন্টুর মা মইরা গেল। আমরাও কবে চইলা যাব তার ঠিক নাই।'

রহিমুদ্দি হাতে চা পেয়েছে, চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমাগোরে দেখনের কেউ নাই। এই ভাবে কষ্ট কইরা দিন কাটাইতেছি কিন্তুক কেউ আইলো না খবর নিতে।'

মানুষটি বলল, 'হ, ঠিকই কইছেন। এইডা প্রতিবারই হয়। কয়েকটা মানুষ মরলি পারে দুই-চাইরজন আহে, সুয়েটার-কম্বল দেয়, তাও কেউ পায় কেউ পায় না।'

রহিমুদ্দি চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দিল তখন দোকানদার বাবুল মিয়া বলল, 'দ্যাশে ভালা মানুষ কইম্মা গ্যাছে গা। যে দুই-চাইর জন দেয় হ্যারাতো খবরের কাগজে টিভিতে পচারের জন্য দেয়। দেখেন না ভিডিও ক্যামেরা লগে কইরাই আনে।'

মানুষটি বলল, 'তয় এর মইদ্যেও ভালা মানুষ আছে। গতবার দেখছি আমাগো বস্তিতে আইসা হগ্গোলরে দিছে। আরো কয়েক জায়গায় দিছিল। নিজে থাইকা আইসা দিছিল। কিন্তুক এই মানুষগুলান বেশি নাই। সবাই চোর হইয়া গ্যাছে।'

দোকানদার বাবুল মিয়া বলল, 'তা ঠিক ভালা মানুষও আছে। ভালা মানুষ আছে বইলাই দুনিয়াডা চলতাছে। ভালা মানুষ না থাকলে কবেই দুনিয়াডা শ্যাষ হইয়া যাইত!'

রহিমুদ্দি বলল, 'হ, ভালা মানুষ তো আছেই। এরকম খবর আগেও শুনছি। নিজে থাইকা আইসা নাকি দিছে, কিন্তুক কয়জনের কপালে আর জোটে! আপনেরা পাইছেন, আমরা তো পাই নাই।'

বাবুল মিয়া আর মানুষটি এক সাথে মাথা নাড়ল। কথা হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলত কিন্তু রহিমুদ্দির চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। সে আটানার বিড়ি কিনে সেখান থেকে চলে এলো।

মফস্বল শহরেরর চায়ের দোকানে এরকম আলোচনা হরহামেশায় হয়। সরকারকে গালি দেয়া থেকে শুরু করে কার বউ মারা গেল, কার মেয়ে পালিয়ে গেল, কার ছেলে বিড়ি ফুঁকে বেড়ায়সহ নানান রকম আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হয় চায়ের দোকানগুলোতে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর অনেক সুখ-দুঃখ-স্বপ্নের কথা হয় এখানে। বাবুলের চায়ের দোকানের মত দোকানগুলো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর আড্ডার প্রাণ।

চা খেয়ে মনে হল রহিমুদ্দি একটু বল পেল। আরো একটু বল পেল সূর্য দেখে। সূর্য উঠছে, আর কোনো চিন্তা নাই। এখন ঝটপট কয়েকটা খ্যাপ মেরে নিতে হবে। তারপর সোজা বাড়ি।

রহিমুদ্দির পরিবারের অবস্থা ভালো না। দুই ছেলে তিন মেয়ে। দুই ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। দুই মেয়ে স্বামীর বাড়ি। ছোট মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নি। দুই ছেলে বলতে গেলে কোনো খোঁজ খবর নেয় না। তাদের অবস্থাও যে ভালো তা না, সবাই গরিব।

আর সব গরিব মানুষের মত রহিমুদ্দিরও এই শীতেই সবচেয়ে বেশি সমস্যা। তাদের কারোরই তেমন কোনো সোয়েটার নেই। পাতলা চাদর একমাত্র সম্বল। তাদের কোনো লেপ বা কম্বলও নেই। বস্তা কেটে সেগুলো গায়ে জড়িয়ে রাত কাটায়। গত শীতে বহু কষ্টে তিনটা বস্তা জোগাড় করেছিল।

শীত আসার আগেই কম্বল কেনার জন্য রহিমুদ্দি তার প্রতিদিনের ইনকাম থেকে বাঁচিয়ে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিল। কিন্তু গরিব মানুষের কপালে যে সুখ আসে না সেটা প্রমাণ করতেই কিনা রহিমুদ্দি হঠাৎ করে অসুখে পড়ল। আর চলে গেল সব টাকা, কম্বল কেনা আর হল না।

গত শীতে কত চেষ্টা করেছে একটা কম্বল জোগাড় করার কিন্তু পারে নি। কোথায় কম্বল-সোয়েটার দেয়া হবে সেটা সব সময় খোঁজ রাখার চেষ্টা করেছে, লাভ হয় নি। কিন্তু এবার একটা কম্বল না হলে যে আর চলে না। এই বুড়ো বয়সের ভাঙা শরীর আর কত সহ্য করতে পারে!

রহিমুদ্দির জন্য আজকের দিনটা ভালই কাটলো। বেশ কয়েকটা বড় খ্যাপ পেয়েছে আজ। মফস্বল এলাকায় খুব বেশি ইনকাম হয় না। শীতে ইনকাম হয় আরো কম। খুব একটা খ্যাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ একটু আলাদা কাটলো রহিমুদ্দির। দেড় টাকার চা, আটানার বিড়ি, দুপুরে দুই টাকার পাউরুটি, এক টাকার কলার দাম বাদ দিয়ে একশ সাতাশ টাকা, মহাজনকে চল্লিশ টাকা দিয়ে বাকি থাকবে সাতাশি টাকা। চাল-ডাল কিনতে না হলে তিন-চারদিন এরকম গেলে রহিমুদ্দি অনায়াসে একটা কম্বল কিনে ফেলতে পারত। বস্তার তলে দুই-তিনটা জামা পড়ে জড়োসড়ো হয়ে কোনো রকমে রাত কাটানো যায় কিন্তু একেবারে তো আর না খেয়ে থাকা যায় না। তাই চাল-ডাল কিনে চেষ্টা করে কিছু টাকা বাঁচাতে, এজন্য অনেকদিন থেকে সে দুপুরে বাড়িতে খায় না। তিন টাকা দিয়ে কাজ সেরে ফেলে। কোনো কোনো দিন আরো এক টাকা বাঁচিয়ে দেয় শুধু একটা কম্বল কেনার জন্য।

তবে রোজ আজকের মত ইনকাম হয় না। অনেকদিন এমনও যায় মহাজনের চল্লিশ টাকা নিয়েই ঝামেলা হয়ে যায়। রিক্সা চালালে আরো ঝামেলা হয়। এই মফস্বল এলাকায় কেউ

তেমন একটা রিক্সায় ওঠে না। তাই রহিমুদ্দি অনেকদিন আগেই রিক্সা চালানো বাদ দিয়েছে। একবার একজনের পরামর্শে ঢাকা গিয়েছিল রিক্সা চালাতে। প্রথম দুইদিন ভালোই ইনকাম হয়েছিল। খুব রাত পর্যন্ত ভাড়া পাওয়া যায়। তৃতীয় দিন আরো অনেক রাত পর্যন্ত ভাড়া মেরেছিল। ঢাকা শহরের ইনকাম দেখে সে সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকাতে থেকে যাবে। ঐদিন রাত দেড়টার দিকে বস্তিতে ফেরার সময় দুই জন হাইজাকার এসে গলায় চাকু ঠেকিয়ে তার কাছ থেকে সব টাকা নিয়ে রিক্সার পাম ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছিল। তারপরের দিনই রহিমুদ্দি আবার এই এলাকায় ফিরে আসে। দুইদিন ইনকাম করে একদিন খোয়ানোর চেয়ে এই মফস্বল শহরে একটু একটু করে ইনকাম করা অনেক ভালো। এই মফস্বল এলাকায় হাইজাকার না থাকলেও সে আর বেশি রাত করে না। আর ঐদিনের পর সে আর রিক্সা চালায় নি।

সন্ধ্যার পর মহাজনের কাছে টাকা আর ভ্যান জমা দিয়ে ফিরে আসে রহিমুদ্দি। সন্ধ্যার পর তেমন একটা ভাড়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ হঠাৎ দুই-একদিন পাওয়া যায় কিন্তু রহিমুদ্দি এই শীতের মধ্যে হঠাৎ পাওয়া ভাড়ার জন্য বসে থাকে না। তবে গরমের দিনে আলাদা ব্যাপার।

রহিমুদ্দির মাথায় কম্বলের কথা ঘুরে ফিরেই ভেসে ওঠে। তাই আজ টাকা আর ভ্যান জমা দিয়ে ফিরে আসার আগে মহাজনকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করে বলল, 'মহাজন, একটা কথা কইতাম।'

'যা কইবা কও।'

'মাইনে, যে হারে জাড় পড়তাছে মহাজন, রাইতে খুব কষ্ট হইতেছে। তাই যদি–'

'শোনো রহিমুদ্দি, তোমারে না কতদিন মানা করছি আমার কাছে ধার-কর্যের কথা কইবা না।'

'না মাইনে, কম্বল ছাড়া জাড়ে খুব কষ্ট হইতেছে মহাজন। তাই কইতেছিলাম কি–'

রহিমুদ্দিকে থামিয়ে দিয়ে মহাজন বলল, 'যাও, যাও, বাড়ি গিয়ে দরজা বন্ধ কইরা গুটিশুটি মাইরা শুইয়া থাকো গা, জাড় লাগবো না।'

তারপর মহাজন বিড়িতে বড় বড় টান দিতে থাকল। রহিমুদ্দি জানতো মহাজনকে বলে কোনো লাভ হবে না। তার গায়ের চামড়া মানুষের চামড়া না, জন্তু-জানোয়ারের চামড়া। তবুও মানুষের মেজাজ-মর্জি বদলাতে পারে এই ভেবেই রহিমুদ্দি মহাজনকে বলেছিল। তাতে কোনো লাভ না হওয়ার বিশেষ কিছু আশাভঙ্গও হল না। রহিমুদ্দি আরো এক কাপ গরম চা খাওয়ার কথা ভাবছিল কিন্তু না খেয়ে শুধু চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে এলো। তার কাছে দেড় টাকাও অনেক টাকা।

রহিমুদ্দির বাড়ি মফস্বল শহরটির বাস টার্মিনালের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে একটা জীর্ণ বস্তিতে। সেখানে রহিমুদ্দির মত খেটে খাওয়া মানুষেরা বাস করে। রহিমুদ্দির বাড়িটি বস্তির গলি থেকে একটু ভেতরে ডান পাশে একটা বাড়ির পেছনে।

রহিমুদ্দির বাড়ি একেবারে যাচ্ছেতাই। অবশ্য বস্তির সব বাড়ির অবস্থাই যাচ্ছেতাই। কোনো কোনোটা আবার রহিমুদ্দির চেয়ে যাচ্ছেতাই। আসলে এগুলোকে বাড়ি বলা যায় না, বলতে হয় ঘর। রহিমুদ্দির বাড়ি না বলে বলা উচিত ঘর। কারণ তার একটামাত্র ঘর। সেই ঘরে তিন বাসিন্দা। আগে অবশ্য আরো দুইটা ঘর ছিল। ছেলেরা চলে যাওয়ায় সে ঘরগুলো আর নেই।

রহিমুদ্দির ঘরটি চাটাই দিয়ে ঘেরা, উপরে খড়। চাটাইগুলো বর্ষার পানিতে ভিজে পঁচে গেছে। জায়গায় জায়গায় ফুটো। কাগজ কুড়িয়ে ভাতের আঠা লাগিয়ে ফুটো বন্ধ করা হয়েছে। ঘরের একপাশে কিছু জায়গা নিয়ে চাটাই দিয়ে ঘিরে সেখানে চুলো করা হয়েছে। উপরে পলিথিন পেপার আর খড় দেয়া। আর পায়খানা-প্রসাব ঘরের পেছনে চাটাই দিয়ে ঘেরা ছোট্ট ঘরটাতে।

রহিমুদ্দি বাড়ি ফিরে মেয়ে আছিয়াকে ডেকে বলল, 'আছিয়া, কই গেলি? এই দিকে আয়।'

'এইতো বাজান আমি এইহানে।'

'আয় এইগুলান নিয়া যা।'

হাতের চাল-ডালের ব্যাগ আছিয়ার হাতে দিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকল। সন্ধ্যা পেরিয়েছে অনেকক্ষণ। আছিয়ার মা চুলোয় রান্না করছিল। চুলোর পাড়ে বসে আগুন পোহানোর জন্য রহিমুদ্দি রান্নাঘরে ঢুকল। দেড় টাকার গরম চায়ের চেয়ে আগুন পোহানো অনেক ভালো। চায়ের চেয়ে আগুনে শরীর গরম হয় বেশি।

আছিয়ার মা বলল, "আহেন বহেন। কিরাম হইল আইজকা?'

'হইছে, ভালাই হইছে। কি রানতাছস?'

'কচুশাগ।'

'আর কি রানছস?'

'আর কিছু না।'

'থাউক, আর কিছু লাগবো না। শাগ আর ভাতেই হইবো।'

'ডাইল রানমু না?'

'নাহ, কয়েকদিন কম কইরা রানদ্ কম কইরা খা। কম্বল কিনতে হইবো। না হইলে চলতাছে না।'

তখন কি যেন মনে পড়ায় আছিয়ার মা বলল, 'ভালো কথাই মনে করছেন। বদরের বাপে কইলো আইজ নাকি কোনে য্যান কম্বল দিছে।'

'কম্বল দিছে! তোরা যাসনাই?'

'আপনেরে না কইয়া ক্যামনে যাই।'

'একটা কম্বলের লাইগা কত চেষ্টা-চরিত করতাছি আর তোরা–'

আছিয়া এরমধ্যে রান্নাঘরে এসে বসেছে। রহিমুদ্দি কথা শেষ না করে আছিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অই ছেড়ি, তুই যাসনাই ক্যান?'

'কি কন বাজান, আপনেরে না জিগায় ক্যামনে যাই!'

রহিমুদ্দি দাঁত কিড়মিড় করে কি বলতে যাচ্ছিল তাকে সুযোগ না দিয়ে আছিয়ার মা বলল, 'আমরা মা-বেটি বাসা-বাড়ির কাম করতে চাইছিলাম, আপনে দেন নাই। দিলে আইজকা একটা না দুইটা কম্বল থাকত। আপনে তখন না কইরা কইলেন আপনেরে না জিগায় কোনো জায়গায় গ্যালে বাড়ি থেইকা বাইর কইরা দিবেন। আপনেই কন আপনেরে না জিগায় ক্যামনে যাই?'

'তাই বইলা কম্বলখান নিতে যাবি না!'

'আপনে অহন চেইতেন না। বদরের বাপের দ্বারে যান। জিগান আর কোনোহানে দিব কিনা। হ্যারা জানবো।'

'শুধু বদরের বাপে পাইছে?'

'না, বস্তির ব্যাবাকতে পাইছে। বদরের বাপ আমাগোরে কইতে আইছিল। আমরা যাই নাই।'

'তগোরে নিয়া আর পারলাম না।'

তারপর গুজগুজ করতে করতে বদরের বাপের কাছে গেল রহিমুদ্দি। আছিয়ার মা অবশ্য ভুল বলে নি। ওরা দুইজন বাসা-বাড়ির কাজ করলে কম্বল-সোয়েটার নিয়ে কাউকে আর ভাবতে হত না। রহিমুদ্দি রাজি হয় নি। তার একটা গোঁ আছে–বাসা-বাড়িতে কাজ করার চেয়ে নাকি না খেয়ে থাকা অনেক ভালো। এরকম ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। অনেক বাসা-বাড়িতে কাজের লোকের উপর অত্যাচার করা হয়, অনেক সময় মারাও যায়। তবে সেটা শহরে, এই মফস্বলে এরকম খবর খুব একটা পাওয়া যায় না। তবুও রহিমুদ্দি রাজি না। তাই ওদের বাসা-বাড়িতে কাজ করা হয় নি। যদিও এই সফস্বল শহরে কাজ পাওয়া সহজ নয়।

বদরের বাপের কাছে জানতে পারল উপজেলা পরিষদের কার্যালয়ে কম্বল দেয়া হয়েছে। কালকে গেলে নাকি পাওয়া যেতে পারে। তাই কাল গিয়ে খোঁজ নেয়ার পরামর্শ দিল বদরের বাপ। কোন্ এক পত্রিকার লোকজন নাকি ইউএনও অফিসে কম্বল দিয়ে গেছে। সেগুলো থেকেই দেয়া হচ্ছে।

রাতে খেতে বসে আছিয়ার মা জিজ্ঞাসা করল, 'বদরের বাপ কি কইলো?'

'কইলো ইওনো অফিসে নাকি দিতাছে। কাইল গ্যালে পাওয়া যাইতে পারে। সকাল সকাল একবার যায়া দেখুম।'

একটু থেমে বলল, 'তয় এরপর থেইকা এসব কামে ভুলে করবি না। কোনোহানে কম্বল সুয়েটারের খোঁজ পাইলে চাইলা যাবি।'

'ঠিকাছে। আইজ কইলেন এরপর থেইকা যামু।'

আছিয়া এরমধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বলল, 'আইচ্ছা বাজান, হ্যারা কয়টা কম্বল দিব? একটাই দিব নাকি–'

আছিয়া কথা শেষ করার আগেই রহিমুদ্দি গলা খেকিয়ে বলল, 'হ্যারা তোর শ্বশুর? একটা দিব না তো দশটা দিব? তোরা দুইজনা আইজকা গেলেই তো দুইটা পাইতি।'

'আমার কি দোষ? আপনেই তো নিষেধ করছেন।'

'আমি কি কম্বল নিতে যাইতে নিষেধ করছি?'

'হইছে ম্যালা হইছে, অহন চুপ যা তো আছিয়া।' আছিয়াকে ধমকে দিয়ে তার মা রহিমুদ্দিকে বলল, 'আইচ্ছা, আপনের লগে আমরাও যাই? তাইলে তিনডা পামু।'

'আমারে আগে যাইতে দে, দেয় কিনা দেহি। আগেভাগেই অতো লাফালাফি করতাছস ক্যান?'

'ঠিকাছে, আপনে আগে যায়া দেখে আসেন।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আছিয়ার মা বলল, 'আল্লায় য্যান এইবার আমাগো দিকে তাকায়। একটা কম্বল পাইলেও ম্যালা।'

রহিমুদ্দি বলল, 'আইজকার মতন যদি সপ্তাখানেক ইনকাম হয় তা হইলে আমিই একখান কিনবার পারুম। আইজ ফুতপাতে দেখছি খুব কম দামে কম্বল বিক্রি হইতাছে। সপ্তাখানেক একটু কম কইরা খাইলেই হইবো।'

আছিয়া বলল, 'খাই আর কত্টুক!'

'এর মধ্যেও কম করতে হইবো। পুরা পেট না খায়া একটু খালি রাখবি।'

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমুদ্দি বলল, 'কি কুক্ষণে যে ব্যারামডা আইছিল! ল, তোরাও খায়া ল।'

আছিয়ার মা বলল, 'আপনে খায়া লন। আমরা পরে খাইতাছি।'

'বেশি কথা বকিস না। ল, থালা ল। আছিয়া থালা ল।'

তারপর সবাই এক সাথে খেতে শুরু করল। অবশেষে কম্বলের একটা খোঁজ পাওয়া গেছে। এখন পেলেই হয়।

রহিমুদ্দি আছিয়াকে গলা খেকিয়ে শ্বশুরের কথা বলে গালি দিয়েছে। কিন্তু তার বিয়ে হয় নি, শ্বশুর থাকার প্রশ্নই আসে না। যদি থাকত তাহলে এই ঝামেলা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হত না। শ্বশুর বাড়িতে নিশ্চয় সে একটা কম্বলের নিচে আশ্রয় পেত।

আসলে এই বস্তিতে অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে আছিয়ার বয়স সবচেয়ে বেশি। এখনো বিয়ে হয় নি। বিয়ে যে আসে না তা না। বর পক্ষের দাবির ফর্দ থাকে অনেক বড় যা রহিমুদ্দির পক্ষে পূরণ করা সম্ভব না। তাই বিয়ে হয় না। আগের দুই মেয়ের বিয়েতে সমস্যা হয় নি কারণ তখন দুই ছেলে রহিমুদ্দির সঙ্গে ছিল। এখন তারা আলাদা হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি। বস্তির লোকেরা এ নিয়ে অনেক কথা বলে কিন্তু রহিমুদ্দির করার কিছুই নেই। অত

দাবি দাওয়া পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব না। তাই আছিয়ার বিয়ে হয় নি। তাহলে আজ একটা কম্বলেই হয়ে যেত, দুইটার কথা ভাবতে হত না।

খাওয়া শেষ করে সবাই শুয়ে পড়ে। শীতের রাত, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে সবাই। মুখে কোনো রকমে খাবার গুঁজে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে!

রহিমুদ্দি গায়ের বস্তাটা আরো ভালভাবে গায়ের সাথে জড়িয়ে ধরে। আর ভাবতে থাকে কাল এই বস্তার জায়গায় থাকবে কম্বল। বস্তা গায়ে দিয়ে আর রাত কাটাতে হবে না। শুধু আজকের রাতটা পাড় হলেই একটা কম্বল পেয়ে যাবে। যদিও মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় কম্বল পাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত না তবুও রহিমুদ্দি মাথা থেকে সে চিন্তা সরিয়ে রাখে।

রহিমুদ্দি ভাবতে থাকে কম্বল গায়ে জড়িয়ে খুব আরাম করে ঘুমিয়ে আছে সে। শীতে আর কাঁপছে না, শীতের কাঁপুনিতে ঘুমাতে কষ্ট হচ্ছে না, খুব আরাম করে ঘুমাচ্ছে সে। এরপর সে ভাবতে থাকে কম্বলটা কেমন হবে খুব মোটা না একেবারেই পাতলা। সে আরো ভাবতে থাকে কম্বলটা কোন রঙয়ের হবে–লাল, নীল, কালো না সবুজ। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ কেন জানি কম্বলের কথা ভাবতে গিয়ে সে একটুও শীত অনুভব করে না। সে একেবারে গভীর ঘুমে চলে যায়।

অন্যদের অবস্থাও রহিমুদ্দির মত। কম্বলের কথাই ভাবছে। একটা কম্বল কিভাবে তিনজন ব্যবহার করবে তা কেউ জানে না। কম্বল আদৌ পাবে কিনা তাও কেউ জানে না। তবুও তাদের মাথায় কম্বলের বিষয়টা ঘুরপাক খেতে থাকে। এক সময় সবাই ঘুমে অচেতন হয়ে যায়।

অন্যদিন সকালে সবাই একটু অলসতা করে। কিন্তু আজ কেউ অলসতা করল না। চটভট বিছানা থেকে উঠে গেল। সকালে মুড়ি আর গুড় খায় ওরা। অনেক সময় গুড় থাকে না তখন শুধু মুড়ি খায় নয়তো পানি দিয়ে ভিজিয়ে খায়। আজ আবার উল্টো গুড় আছে মুড়ি নেই। দুই টাকার মুড়ি কিনে তিনজন একসাথে বসে গুড় মুড়ি খেতে থাকে।

ইউএনও অফিস সকাল নয়টার আগে খোলে না। শীতের দিনে আরো একটু দেরি হয়। কিন্তু রহিমুদ্দি আগেই যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সে রওনা দেয়। প্রথমেই ইউএনও অফিস যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। ফিরে এসে ভ্যান নিয়ে বের হবে। ইউএনও অফিস খুব বেশি দূরে না। বাস টার্মিনাল থেকে একটু সামনে বাইপাস রাস্তার ধারে উপজেলা পরিষদের কার্যালয়। বেশি দূরে হলে ভ্যানটা নিয়ে বের হত। যেহেতু বেশি দূরে না তাই আর ঝামেলা করল না। এমনিতেই কুয়াশায় চারিদিকে ঢেকে আছে এর মধ্যে হেঁটে যাওয়াই ভালো। রহিমুদ্দি অবশ্য আরো একটা বিষয় ভাবছে–এরকম একটা কাজে মহাজনের মুখ দেখে যেতে তার আপত্তি আছে!

বস্তি থেকে বেরিয়ে গলির সামনে আসতেই একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রহিমুদ্দি, এত সাত সকালে যাও কই? অহনই ভ্যান নিয়া বাইর হইবা নাকি? এই বয়সেও যে কিরাম কইরা পার বুঝিনে।'

'না, না, ভ্যান নিয়া যামু না। একটু ইওনো অফিসে যামু। কাইল নাকি কম্বল দিছে, আমি তো জানতে পারি নাই, পাইও নাই। তাই একটু ঘুইরা আসি দেহি পাই কিনা।'

'কাইল কম্বুল পাও নাই! অসুবিধা নাই, যাও আইজকা পাইবা।'

'হাছা কইতাছো নাকি গুল মারতাছো?'

'আরে বস্তির কে পাইছে কে পায় নাই হের লিষ্টি করা আছে। আইজকা পাইবা, না পাইলে আমারে আইসা কিল দিও।'

সদর আলীর কথা শুনে রহিমুদ্দির চোখমুখ এনার্জি সেভিং বাল্বের মত উজ্জল হয়ে গেল। সে আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত পা চালাতে শুরু করল।

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে এসে দেখে মেইন দরজা খোলা। সে ভেতরে ঢুকে যায়। দরজায় দারোয়ান থাকার কথা কিন্তু নেই। সে এর আগেও এখানে এসেছে। দেখে বুঝতে পারল এখনো অফিস খোলে নি, ইউএনও সাহেব আসেন নি।

রহিমুদ্দি একটা বারান্দায় এসে বসে পড়ল। বিশ-বাইশ গজ দূরে ইউএনও সাহেবের চেম্বার। তার মনে একটু ভয় জাগে যদি না পায়, যদি তার নাম বলে অন্য কেউ নিয়ে চলে যায়! কিন্তু সে জোর করে মাথা থেকে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা সাদা জিপ গাড়ি ভেতরে ঢুকল। রহিমুদ্দির বুঝতে বাকি রইল না এটা ইউএনও সাহেবের গাড়ি। এর আগেও সে দেখেছে। একদিন একটা মাল ভ্যানে করে তাঁর বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল তাই ইউএনও সাহেবকেও সে চেনে যদি নতুন ইউএনও না এসে থাকে।

গাড়িটা এসে থামল রহিমুদ্দি যেখানে বসেছিল সেখান থেকে একটু দূরে। দেখতে পেল ইউএনও সাহেব নামছেন। তাঁকে চিনতে অসুবিধে হল না রহিমুদ্দির। সে দাঁড়িয়ে গেল।

ইউএনও সাহেব তাঁর অফিস রুমের দিকে যেতে গিয়ে মনে হয় রহিমুদ্দিকে দেখতে পেলেন কারণ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রহিমুদ্দির দিকে তাকালেন। তারপর পাশের একজনকে কি যেন বললেন। পাশের মানুষটি রহিমুদ্দিকে ঈশারা করে ডাকল। রহিমুদ্দি গায়ের পাতলা চাদরটা ভালভাবে গায়ের সাথে জড়িয়ে এগিয়ে গেল। ইউএনও সাহেবের কাছে এসে তাঁকে সালাম দিল। ইউএনও সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে কি করছ?'

'স্যার, কাইলকা নাকি এইহানে কম্বল দিছে? আমি জানতে পারি নাই, আমি কম্বল পাই নাই। বস্তার চট দিয়ে হয় না স্যার। আমারে যদি একখান কম্বল দিতেন–'

কথা শেষ করার আগেই ইউএনও সাহেব বললেন, 'তুমি সত্যিই কম্বল পাও নাই নাকি মিথ্যে বলছো আরেকটা নেবার জন্য?'

'না স্যার, আমি মিথ্যা কইতাছি না স্যার, আমি সত্যিই কম্বল পাই নাই। আমি–'

রহিমুদ্দিকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে পাশের একজন বলল, 'সমস্যা নাই স্যার। লিস্ট তো করাই আছে, দেখলেই বুঝা যাবে।'

পাশের অন্যজন বলল, 'আমার মনে হয় মিথ্যে বলছে না স্যার। আমি একে চিনি। আপনার বাসায় একদিন কাজ করেছে।'

ইউএনও সাহেব রহিমুদ্দির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই নাকি!'

'জে স্যার। আমি ভ্যান চালাই। একদিন একটা বড় বাক্স আপনার বাড়িত নামায় দিছিলাম।'

'তোমাকে দেখে তো মনে হয় তোমার বয়স অনেক। তুমি এখনো ভ্যান চালাও!'

'কি করমু স্যার, দুইডা পোলা আছে কিন্তুক কেউই দেখে না। হ্যারা থাকলে কি আর আমারে হাত পাততে হয়!' রহিমুদ্দির চোখ ছলছল করে ওঠে।

ইউএনও সাহেব মুখে আপসোসের একটা শব্দ করলেন, তারপর বললেন, 'যাও একে একটা কম্বল দিয়ে দাও।'

রহিমুদ্দি একবার ভাবলো তার দুইটা কম্বল দরকার এই কথাটা ইউএনও সাহেবকে বলবে কিন্তু বলতে পারল না। বলে অবশ্য লাভ হত না, বস্তির প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটা করেই কম্বল বরাদ্দ।

ইউএনও সাহেব চলে যাবার পর তাকে একটা ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা কম্বল এনে তার হাতে দেয়া হল। কম্বলটা হাতে পেয়ে তার চোখমুখ আনন্দে চকচকে হয়ে যায়। অনেকদিন পর সে একটা কম্বল হাতে পেল। তার নাম খুঁজে বের করে লিস্টে টিক চিহ্ন দেয়া হল। না, তার নাম বলে অন্য কেউ সেটা নিয়ে যায় নি।

এক মুহূর্ত দেরি না করে সে বাড়ি যাবার জন্য রওনা হল। তখনো চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। ভালো করে খুব বেশি দূর দেখাও যায় না। কিন্তু এর মধ্যেই তার ইচ্ছে হল বুড়ো বয়সের ভাঙ্গা শরীরটা নিয়ে দৌড় দিতে।

রহিমুদ্দি কম্বলটা চাদরের উপর দিয়ে শরীরে জড়িয়ে নেয়। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে তার অন্য রকম অনুভূতি হতে থাকে। উত্তেজনায় তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে কিন্তু সে কাঁপুনি কষ্টের নয় আনন্দের।

নীল রংয়ের কম্বলটা শরীরে জড়িয়ে তাতে হাত বুলাতে বুলাতে হেঁটে আসে রহিমুদ্দি। বড় শখের কম্বল। তার সমস্ত চিন্তা এখন এই নীল রংয়ের কম্বলটাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সে সেভাবেই হাঁটতে থাকে। উপজেলা পরিষদের মেইন গেট থেকে বেরিয়ে বেখেয়ালেই পার হতে থাকে রাজধানীমুখী মহাসড়কটি। মাঝ পথে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। বিপরীত দিক থেকে একটি মালবাহী ট্রাক বেশ বেগ নিয়ে ছুটে আসতে থাকে। রহিমুদ্দি আচমকা রাস্তার মাঝখানে হাজির হয়েছে বলে ট্রাক ড্রাইভার হতবিহ্বল হয়ে গেছে। কোনো কিছু না বুঝে রহিমুদ্দি যখন পেছনে ফিরে যাচ্ছিল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মালবাহী ট্রাকটি রহিমুদ্দিকে সজোরে আঘাত করল। বুড়ো বয়সের ভাঙা শরীর নিয়ে রহিমুদ্দি পাঁচ-ছয় ফুট দূরে ছিটকে পড়ে আট-দশবার গড়াগড়ি খেল। আর ট্রাকটি বিপরীত দিকের দোকানগুলোতে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে হো হো শব্দ করে পাবলিক ছুটে আসতে থাকে। ড্রাইভার হেলপার পালানোর চেষ্টা করলেও পাবলিকের ফাঁক গলে বের হতে পারল না। শুরু হয়ে গেল গণধোলাই।

রহিমুদ্দির সারা শরীর রক্তে মাখা। কম্বলটা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। তাকে ঘিরে বেশ কয়েকজন। শীতের সকাল বেশি লোক নেই, সব দোকানপাট এখনো খোলে নি। তবুও রহিমুদ্দির চেনা মানুষ থাকার কথা। কারণ সে এই রাস্তা দিয়েই ভ্যান চালায়। এখানে তার অনেক পরিচিত মানুষ আছে। কয়েকজন তাকে চিনতে পারল। রহিমুদ্দিও মনে হয় চিনতে পারল। মানুষেরা তার পাশে বসতেই সে কি যেন বলতে চাই ছিল কিন্তু বলতে পারল না। শুধু ঠোঁট দুটো একটু নড়ল। তারপর তার শরীর একেবারে শিথিল হয়ে গেল। একজন হাতের পাল্‌স দেখে বলল, 'শ্যাষ।'

আর তখন সেখানে রহিমুদ্দিকে ঘিরে যতজন ছিল সবাই ধোলাইয়ে যোগ দিল। রহিমুদ্দির রক্তমাখা কম্বল জড়ানো নিথর দেহটা রাস্তার পাশে পড়ে রইল।

কম্বলটা নিয়ে রহিমুদ্দির বাড়ি ফেরা হল না। কয়েক মিনিট আগেও সে মনে মনে বলেছে আজ রাতে সে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরাম করে ঘুমাবে। ঘুমানোর জন্য তার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না।

বাইরে হৈ চৈ এর শব্দ শুনে ইউএনও সাহেব নিজে বেরিয়ে এলেন। তারপর রহিমুদ্দির লাশের পাশে এসে চমকে উঠলেন। রক্তমাখা কম্বল জড়ানো যে নিথর দেহটা দেখছেন মাত্র পাঁচমিনিট আগে তার সাথে কথা বলেছেন। মাত্র পাঁচমিনিট আগে একটা কম্বল চেয়েছিল তাঁর কাছে। সেই কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে এখন সে রাস্তার পাশে পড়ে আছে। মাত্র পাঁচমিনিট আগের এই মানুষটা এখন একটা রক্তমাখা লাশ!

দুপুর হতে চলল রহিমুদ্দি এখনো কম্বল নিয়ে ফিরল না। আছিয়া আর আছিয়ার মা ঘরের দরজার কাছে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। রহিমুদ্দি কম্বল পেলে বাড়ি আসার কথা। রহিমুদ্দি আসছে না দেখে তারা ধরে নিয়েছে কম্বল পায় নি বলে আর ফেরে নি। রহিমুদ্দি যে মারা গেছে সে খবর এখনো বস্তিতে দেয়া হয় নি।

কিছুক্ষণ পর রহিমুদ্দি ফিরে এলো। পোস্টমর্টেম করিয়ে চাটাই দিয়ে জড়িয়ে একটা লাশ রহিমুদ্দির বাড়ির সামনে আনা হলে আছিয়া আর আছিয়ার মা উৎসুক হয়ে ছুটে যায়। বস্তির কেউ হয়তো মারা গেছে। কে সেটা জানতে ছুটে যায় তারা কিন্তু লাশটা তাদের ঘরের সামনে রাখা হল দেখে বিস্মিত হল।

লাশের মুখ খুলতেই আছিয়ার মা আর আছিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে, তারপর তুমুল আর্তচিৎকার করে ওঠে যেন আকাশটা ফেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে।

আছিয়ার মা আর আছিয়া বিলাপ করতে থাকে। মানুষটা একটা কম্বল নিতে গেল অথচ ফিরল লাশ হয়ে। এত সাধনার পর একটা কম্বল পাওয়া গেল কিন্তু সেটা গায়ে জড়িয়ে একটা রাতও কাটানো হল না মানুষটার। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না ওরা। যে কম্বলটা তারা পেয়েছে সেটা রহিমুদ্দির রক্তে ভেজা। রক্তে ভেজা কম্বলটা বুকে চেপে আর্তনাদ করতে থাকে মা-মেয়ে। কিছুতেই থামানো যায় না।

বহুক্ষণ ধরে বিলাপ করে অবশেষে ওরা দুইজন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। ইউএনও সাহেব নিজ খরচে রহিমুদ্দির লাশ দাফন করেছেন। আজ সবাই এসেছে। দুই ছেলে, দুই মেয়ে, জামাই আর বাচ্চারা। এত মানুষ একটা ঘরে কিন্তু মনে হচ্ছে কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। বাচ্চারাও নড়াচড়া বন্ধ করে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। এখনো কান্নার চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সবাই একদৃষ্টে একটি দিকে তাকিয়ে আছে। কম্বলটার দিকে, ধুয়ে শুকাতে দেয়া হয়েছে ঘরের মধ্যে।

গত রাতে রহিমুদ্দি যখন ছিল তখন এই কম্বল নিয়ে কথা হয়েছে। এখন এই সন্ধ্যায় সে নেই। তার জায়গায় আছে এই কম্বল যেটা গায়ে জড়িয়ে সে ঘুমাতে চেয়েছিল, খুব আরাম করে ঘুমাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে আশা তার পূরণ হল না। তার আগেই সে চিরতরে ঘুমিয়ে গেল মাটির কম্বল গায়ে দিয়ে।

কিছুদিন পরের কথা।

সবাই মোটামুটি শোক সামলে নিয়েছে। গরিব মানুষের বেশিদিন শোক পুষে রাখতে হয় না, পেটের ধান্দা করতে হয়। আছিয়ার মা আর আছিয়াকে এখন কাজ করতে হয়। বাসা-বাড়ির কাজ, যে কাজ করতে রহিমুদ্দি সম্মতি দেয় নি, রহিমুদ্দির মতে যে কাজ করার চেয়ে না খেয়ে থাকা অনেক ভালো এখন ওদের সে কাজই করতে হয়। ওদের কিছু করার ছিল না। ছেলেরা আবার পর হয়ে গেল। তাই সব ভুলে বাসা-বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নিতে হল। খুব সহজেই পেয়ে গেল। আছিয়ার মা এক বাড়িতে আছিয়া আরেক বাড়িতে।

শীত এখনো যায় নি। রহিমুদ্দির সেই কম্বলটাই এখন এই দুইজনের একমাত্র সম্বল। প্রতিরাতে এই কম্বলটা গায়ে জড়িয়েই তারা রাত কাটায়।

সারাদিনের কাজ শেষ করে আছিয়ার মা আর আছিয়া শুতে গেল। শুতে গিয়ে আছিয়ার মা থেমে গেল। তারপর কম্বলটার দিকে তাকিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

আছিয়া বলল, 'কি হইল মা, কি দেখছো? শুইয়া পড়।'

'দেখতো এখনো তোর বাপের রক্ত লাইগা আছে! কেমুন কইরা যে ধুইশ!'

প্রতিবার কম্বলটা গায়ে দিতে গিয়ে আছিয়ার মায়ের মনে হয় এখনো কম্বলটাতে রক্ত লেগে আছে। তার চোখের সামনেই অনেকবার ধোয়া হয়েছে তবুও তার মনে হয় রক্ত লেগে আছে।

আছিয়া খেকিয়ে উঠে বলল, 'কই রক্ত লাইগা আছে? তুমি ভুল বকতাছো। শুইয়া পড়তো।'

রোজ রাতে শোয়ার সময় আছিয়াকে অন্তত একবার তার মাকে বকুনি দিতে হয়। তারপর আছিয়ার মা আর আছিয়া কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

রহিমুদ্দির রক্তমাখা কম্বল।

[২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে এই গল্প লেখা। 'চ্যানেল আই'-তে 'হৃদয় মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে এর উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদনও প্রচার করা হয়। 'কেরামত আলী' নামের এক হতদরিদ্র ব্যক্তি একটি শীতের চাদরের জন্য অনেকের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছেন কিন্তু পান নি। শেষে কোনো একজনের পরামর্শে উপজেলা পরিষদের কার্যালয়ে গেলে ইউএনও সাহেব তাঁকে একটি চাদর দেন। চাদরটি পেয়ে 'কেরামত আলী' আনন্দে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। তারপর চাদরটি নিয়ে উপজেলা পরিষদ থেকে বেরিয়ে গেট সংলগ্ন মহাসড়কে উঠলে একটি বালুভর্তি ট্রাক তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। সাথে সাথেই প্রাণ হারান তিনি। পথচারিরা তাঁর লাশ সেই চাদরটি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার এই কাল্পনিক গল্প।]

ঘন অন্ধকারের খোঁজে

শারমিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের তিন সন্তানের সবার বড় শারমিন। মেয়ে হলেও বাবা-মা তাকে উচ্চ শিক্ষিত করতে চায়। শারমিন লেখাপড়া করে অনেক বড় হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে এটাই তার বাবা-মার চাওয়া। বাবা-মায়ের চাওয়াটা যে অযৌক্তিক নয় তা সে বরাবরই প্রমাণ করে আসছে। মাধ্যমিকের মত উচ্চ মাধ্যমিকেও সে গ্রামের কলেজ থেকে 'এ' প্লাস পেয়েছে। এবার চাওয়াটাও একটু বেড়ে গেল। মেডিকেল নয়তো বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো একটাতে ভর্তি হতে হবে। তার আগে নামতে হবে যুদ্ধে। শারমিনের মত মেধাবী ছাত্রীর জন্য এটা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা ওকে গ্রাম-পরিবার ছেড়ে শহরে যেতে হবে। এটা ভেবেই ওর মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বাবা-মায়ের স্বপ্নের কথা মাথায় রেখে অন্য সব ভাবনা সে দূরে সরিয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার পরেও শারমিন মেডিকেলে চান্স পেল না। শুধু শারমিন নয় আরো অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী চান্স পেল না। প্রশ্ন ফাঁসের মত অনেক বড় একটা দুর্নীতি হয়ে গেছে। আন্দোলন হল কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। ফলাফল বাতিল করে আবার নতুন করে পরীক্ষা নেয়া হল না এত বড় দুর্নীতি প্রকাশ পাবার পরেও। শারমিন হতাশ হয়ে পড়েছিল কিন্তু ওর আব্বুর কথার কারণে ও হতাশা কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিতে লাগল।

শারমিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে গেল মনের মত সাবজেক্টে। এবার ছেড়ে আসার পালা। বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে হলে তাকে গ্রামের পরিচিত বিশুদ্ধ পরিবেশ ও পরিবারের মত মায়াবী জগৎ ছেড়ে শহুরে কোলাহলে আসতেই হবে। তবু মন মানছিল না শারমিনের। কিসের যেন একটা অশুভ বাতাস তাকে উতলা করে দিচ্ছিল। পৃথিবীতে শারমিন যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে সে হচ্ছে তার আব্বু। শারমিন যখন শহরে আসার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত তখন আব্বু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'মারে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, বড় হতে হলে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে প্রতি পদেই তোকে সংগ্রাম করতে হবে। তুই যদি পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ না হতে পারিস তবে সে সংগ্রামে বারবার তুই পিছিয়ে পড়বি। সামনে এগুতে পারবি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা কর, মানুষের মত মানুষ হয়ে ফিরে আয়। আরে, পড়াশুনা করার জন্যে চীন দেশে যাওয়ার অনুমতি আছে আর তুই তো মাত্রা কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে যাচ্ছিস। এতে এত চিন্তার কি আছে, মন খারাপেরই বা কি আছে? পাগলী মেয়ে কোথাকার?'

আব্বুর এসব কথায় শারিমন সবসময়ই হতাশা থেকে রেবিয়ে আসে। ভীতি ভুলে বুকে সাহস পায়। তাই আব্বুর হাত ধরেই শারমিন একদিন শহরে চলে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল। প্রথমেই হোস্টেলে সিট না পাওয়ায় শারমিনকে একটা মেসে রেখে গেল আব্বু। হোস্টেলে সিট পেলে সেখানে চলে যাবে।

তারপর চলে আসার আগে আব্বুকে জড়িয়ে সে কি কান্না শারমিনের যেন আব্বু তাকে বাঘের খাঁচায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছে।

আব্বু চলে যাবার পরও শারমিন মেসের গেটে দাঁড়িয়ে থাকল। সে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। এখানে সে কার কাছে থাকবে, কার সাথে কথা বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। বাবা-মাকে ছাড়া সে কোথাও কখনো একা থাকে নি, কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে পর্যন্ত না। অথচ এখন থেকে তাকে একাই থাকতে হবে এই অচেনা পরিবেশে। শারমিন নিজেকে অসহায় ভাবতে লাগল, তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইল। ঠিক তখন শারমিন চমকে উঠল,

পেছন থেকে কে যেন তার পিঠে হাত রেখেছে। সে পেছনে তাকিয়ে দেখল মেসের এক বড় আপু। সে আপুটির দিকে হা করে তাকিয়ে থাকল।

বড় আপুটি শারমিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে বুঝলি। দুদিন পর দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শারমিন কোনো কথা বলল না। এ রকম পরিবেশে কি কথা বলতে হয় শারমিন জানে না। সে তেমন মিশুক নয় এই অভিযোগ তাকে সারাজীবন শুনতে হয়েছে। সে গ্রামে বড় হয়েছে। শহরে এই প্রথম। ভাষাটাও একটু গ্রাম্য আর আহ্লাদী। তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হল মোটামুটি সুন্দরী হালকা পাতলা শারমিনের। কিন্তু শায়লা নামের বড় আপুটি শারমিনের মাথা নিচু করে চুপচাপ থাকা নিয়ে মাথা ঘামাল না। বলল, 'চল, উপরে গিয়ে তোর বায়োডাটা নিয়ে ফেলি।'

প্রথম থেকেই যে মানুষ তুই করে বলতে পারে সে মানুষ ভালো-মন্দ দুই রকমই হতে পারে। শারমিনের মনে হল শায়লা আপু আর যাই হোক ভালো মানুষ হতে পারে না। তার কথা বলার ধরনটা কি রকম যেন। শারমিনের মনে হল এই আপু বখে যাওয়া কোনো উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে। প্রথমেই এরকম একজনের সাথে পরিচয় হওয়াটা শারমিনের মনে অস্বস্তি বাড়িয়ে দিল।

শায়লা আপু শারমিনকে দোতলায় তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। ছয়তলা এই মেসটা একটু হাইফাই। সবার জন্য সিঙ্গেল রুম। রুমগুলো একটু ছোট হলেও ভালোভাবে পড়াশোনা করার জন্য সিঙ্গেল রুমের বিকল্প নেই। বুঝে শুনেই শারমিনকে একটু হাইফাই মেসে রেখে গেল আব্বু যাতে পড়াশোনার সময় রুমমেটের জ্বালাতন সইতে না হয়।

শায়লা আপুর রুমে আরো দশ-বারোজন হাজির হয়েছে। শায়লা আপু জিজ্ঞেস করল, 'তোর নাম কি?'

মাথা নিচু করে শোনা যায় না এরকম স্বরে শারমিন বলল, 'শারমিন।'

শায়লা আপু বড় রকমের কোনো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে এরকম ভাব করে বলল, 'যাক, তুই তাহলে কথা বরতে পারিস! আমি আবার ভেবেছিলাম তুই বোবা।'

কথাটা শুনে সবাই এমনভাবে হাসতে লাগল যেন শায়লা আপু খুব মজার একটা কৌতুক বলেছেন। একটা মেয়ে বলল, 'কিন্তু আমরা তো নামটা শুনতেই পেলাম না।'

'তাতে সমস্যা নাই। কথা যখন বলতে পারে তখন ভলিউম বাড়িয়ে নেয়া যাবে।' শায়লা আপুর কথা শুনে এবারও সবাই এমনভাবে হেসে ফেলল যেন কথাটা খুব মজার।

শায়লা আপু আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোর নামটা আবার বল।'

মাথা নিচু করেই যতটা সম্ভব জোরে নামটা বলার চেষ্টা করে শারমিন বলল, 'শারমিন।' কিন্তু তাতে আগের চেয়ে খুব বেশি উন্নতি হল না। তারপরও নামটা সবাই শুনতে পেল।

শায়লা আপু লাফিয়ে উঠে বলল, 'কি বললি! শারমিন! তোর নামের সাথে আমার নামের তো ভালোই মিল আছে। তোরও প্রথমে 'শা' আমারও। যাকগে, আমার নাম হচ্ছে শায়লা। আমি এই পুরো ছয়তলা বিল্ডিংয়ের লিডার। এটা সবসময় মাথায় রাখবি।'

শায়লা আপু আরো কি বলতে যাচ্ছিল তার আগেই একটা মেয়ে বলল, 'ডাক নাম দিয়ে তো হবে না আপু। পুরো নাম লাগবে।'

শারমিন এবার মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে চশমা পরা একটা মেয়ে খাতা আর কলম নিয়ে বসে আছে। মেয়েটা শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভালো নাম কি তোমার?'

শারমিন এবার মাথা তুলে রেখেই উত্তর দিল, 'শারমিন আক্তার।'

'আর কোনো ডাক নাম আছে?'

'না।' আসলে আছে। পাখি। আব্বু আদর করে ওকে পাখি বলে ডাকে। ছোট বেলা থেকেই শারমিন খুব চঞ্চল। তাই আব্বু ওর নাম দিয়েছে পাখি। এই নাম শারমিন কাউকে বলে

না। আব্বু ওকে আদর করে যে নামে ডাকে সে নাম সবাইকে বলতে হবে কেন? এই মুহূর্তে ওকে দেখে হ্যাবলা ক্যাবলা মনে হলেও ও মোটেই সেরকম না।

চশমা পরা মেয়েটা আবার বলল, 'তোমার আব্বুর নাম বলো।'

শারমিন আব্বুর নাম বলল।

'আম্মুর নাম বলো।'

শারমিন আম্মুর নাম বলল।

'আব্বু কি করে?'

শারমিন উত্তর দিল।

'আম্মু কি করে?'

সেটাও উত্তর দিল।

'কয় ভাইবোন?'

শারমিন উত্তর দিল।

'বাসার ঠিকানা বলো।'

শারমিন বাসার ঠিকানা বলল।

'জন্ম তারিখ বলো।'

সে জন্ম তারিখ বলল।

'উচ্চতা কত? আর ওজন?'

শারমিন সঠিক জানে না, অনুমান করে বলল।

'এবার বলো কিসে পড়ো?'

শারমিন বলল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

'গুড।'

চশমা পরা মেয়েটা কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল। তারপর নাকের ডগা থেকে চশমাটা উপরে তুলে দিয়ে বলল, 'এইবার ঝটপট এস.এস.সি. আর এইচ.এস.সি.-র রেজাল্ট বলে ফেলো।'

'এ-প্লাস।'

সবাই বিস্ময়ের একটা শব্দ করে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। চশমা পরা মেয়েটা বলল, 'দুটোতেই!!'

'হ্যাঁ।'

এক নিঃশ্বাসে এতক্ষণ শারমিন সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। সে রীতিমত ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। এবার অন্যেরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল শারমিনের রেজাল্ট শুনে। ওদের ভাব দেখে মনে হল 'এ' প্লাস পাওয়া খুব বিস্মিত হওয়ার মতই একটা ব্যাপার।

সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিল। চশমা পরা মেয়েটা নীরবতা ভাঙল, সে খাতা বন্ধ করে বলল, 'শায়লা আপু আমার কাজ কমপ্লিট।'

'ওকে। এবার তাহলে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা যাক।'

চশমা পরা মেয়েটা উঠে গেল এবং সেখানে আরেকটা মেয়ে এসে বসল। মেয়েটাকে দেখে শারমিনের প্রায় হার্টফেল করার মত অবস্থা। মেয়েটা শার্ট-প্যান্ট পরে আছে। শারমিন সামনাসামনি কখনো মেয়েদেরকে শার্ট-প্যান্ট পরে থাকতে দেখে নি। হিন্দি সিনেমা বাংলা সিনেমায় দেখেছে। সিনেমায় ছাড়া সত্যি সত্যি কোনো মেয়ে শার্ট-প্যান্ট পরে থাকতে পারে নিজের চোখে না দেখলে শারমিন কখনো বিশ্বাস করত না। মেয়েটা মোটামুটি সুন্দরী, চুল রং করা এবং স্টাইল করে কাটা, হাতে কি যেন পড়ে আছে শারমিন নাম জানে না। যে প্যান্টটা পরে আছে সেটা হাফ প্যান্টও নয় ফুল প্যান্টও নয়, দুটোর মাঝামাঝি। আর শার্টটা এতই ছোট যে হাত দুটো একটু উপরে তুললেই নাভি দেখা যাবে। শারমিন মেয়েটার দিকে হা করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

মেয়েটা একটা খাতা খুলে শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন তোমাকে যে সব প্রশ্ন করা হবে তার ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে, মিথ্যে বলার চেষ্টা করবে না। কেমন?'

শারমিন মাথা কাত করে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল।

'তুমি তো গ্রামের মেয়ে। গাছে উঠতে পারো নিশ্চয়?'

'আগে পারতাম এখন পারি না।' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে শারমিনের লজ্জা লাগছে, তবুও সে মেয়েটার দিকে তাকিয়েই উত্তর দিল।

'তার মানে তুমি আগে গাছের ফল চুরি করতে পারতে এখন পারো না?' মেয়েটা একটু কৌতুক করে বলল। ওর কথা শুনে সবাই হেসে ফেলল। শারমিন অবশ্য হাসিতেও কার্পণ্য বজায় রাখলো, খুব বেশি হাসল না, ভদ্রতা করে একটু হাসল।

শারমিন গলায় একটু জোর দিয়ে বলল, 'আমাকে অন্যের গাছের ফল চুরি করে খেতে হয় না। আমাদের বাসায় দুইটা আম, তিনটা পেয়ারা, একটা বরই আর একটা আতা ফলের গাছ আছে। এছাড়াও কয়েকটা ডাব ও খেজুর গাছ আছে।'

'ফল ছাড়া অন্য কিছু কখনো চুরি করো নি?'

'না।'

মেয়েটা একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, 'কিছুই না? একটা ছোট খাটো কিছুও না?'

'না।'

'সত্যি বলছো তো?'

'আমার আব্বু তিনটা জিনিস খুবই অপছন্দ করেন–মিথ্যা বলা, চুরি করা আর নেশা করা। এই তিনটা জিনিস এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।'

মেয়েটা এবার বিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, 'গুড। ভেরি গুড।'

মেয়েটা শারমিনকে আবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তুমি মারামারি করতে পারো?'

'এখন পারি না।'

'আগে পারতে?'

'ছোটবেলায় একটু একটু পারতাম।'

'বড় হয়ে ভুলে গেছো বুঝি?'

'অনেকটা সেরকমই।'

পাশ থেকে একটা মেয়ে বলল, 'আসো না একটু মারামারি করে দেখি ভুলে গেছো নাকি মানে আছে।'

শারমিন কোনো কথা বলল না। শুধু মেয়েটার দিকে একটু তাকালো। শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়েটা আবার প্রশ্ন করল, 'তোমার কোনো ব্যাড রিপোর্ট নাই?'

'না।'

'স্কুল কলেজ কিংবা বাসায় তোমার নামে কোনোদিন কোনো নালিশ আসে নি?'

শারমিন বরাবরের মত ছোট করেই উত্তর দিল, 'না।'

পাশের মেয়েটা আবার বলল, 'মারামারি করতে না পারলে ব্যাড রিপোর্ট আসবে কিভাবে?'

মেয়েটার দিকে শায়লা আপু চোখ পাকিয়ে তাকাল। মেয়েটা আর কিছু বলার সাহস পেল না।

'কোনোদিনই না? ছোটখাটো কোনো নালিশও না?' শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়েটা আবার জানতে চাইল।

শারমিন মনে করার চেষ্টা করল। এবং একটা নালিশের কথা মনে পড়ল, বলল, 'শুধু একবার–'

'শুধু একবার?' সবাই শারমিনের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায়।

'ক্লাস সেভেনে একবার পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছিলাম বলে হেডস্যার বাসায় এসে আব্বুকে নালিশ দিয়ে গিয়েছিলেন।'

প্রায় সবারই আশাভঙ্গ হল। তারা অন্য কিছু আশা করেছিল।

শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়েটা কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে থাকল, তারপর বলল, 'শায়লা আপু, আর কি জিজ্ঞেস করব? আর তো কিছু পাচ্ছি না।'

'ওকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মাঝে যে নতুন অতিথি এসেছে সে ফাটাফাটি ভালো ছাত্রী এবং ফাটাফাটি ভালো মেয়ে। সুতরাং, ওকে আমাদের সম্মান করা উচিত। তোরা সবাই ওকে তুমি এমনকি আপনি বলে ডাকবি। তুই তোকারি করবি তো সবার মাথা ভেঙে ফেলব। বুঝেছিস সবাই?'

সবাই চিৎকার করে বলল, 'হ্যাঁ শায়লা আপু।'

'তবে শোন শারমিন–' শায়লা আপু শারমিনের দিকে তাকাল শারমিন শায়লা আপুর দিকে তাকাল, 'আমি কিন্তু তোকে কখনো তুমি করে বলতে পারবো না। তুই যদি আইনস্টাইনের নাতনিও হতি তবু আমি তোকে তুই করে বলতাম। বুঝছিস?'

'জ্বি, বুঝেছি। আমাকে তুই করে বললে সমস্যা নাই। আমি কিছু মনে করব না।'

শুধু ভদ্রতার খাতিরেই কথাটা বলল শারমিন। শায়লা আপুর তুই করে বলার ভঙ্গিটা মোটেও ভালো লাগছে না শারমিনের অথচ এই ভালো না লাগা ডাকটা তাকে শুনতে হবে যতদিন না সে হোস্টেলে সিট পাচ্ছে। কে জানে হোস্টেলেও এরকম শায়লা আপু আছে কিনা!

শায়লা আপু শারমিনের পিঠে হাত দিয়ে নরম করে বলল, 'তোকে এতক্ষণ ধরে এতসব প্রশ্ন করলাম বলে তুই কিছু মনে করিস না। আসলে যারা নতুন আসে তাদের একটু বাজিয়ে দেখা হয়, নতুন মানুষটা কেমন সেটা বোঝার একটা এক্সপেরিমেন্ট আর কি। তুই কিছু মনে নিস না।'

শারমিন ভদ্রতার হাসি দিয়ে বলল, 'না, না, আমি কিছু মনে করি নি, ঠিক আছে।'

শায়লা আপু উঠে দাঁড়াল। তারপর শারমিনকে বলল, 'আমার এখন ভালো লাগছে নারে। আমি বিকেলে তোর সাথে কথা বলব, কেমন?'

শারমিন মাথা কাত করে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। শায়লা আপু অন্য রুমে চলে গেল। যাবার সময় শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়েটাকে বলল, 'শারমিনকে আমাদের নিয়মপত্রটা দিয়ে দিস।'

'ঠিক আছে শায়লা আপু।'

শায়লা আপু চলে যাবার পর সবাই শারমিনকে ঘিরে ধরল। আরো চার-পাঁচজন এসেছে রুমে। একটা মেয়ে ফিসফিস করে শারমিনকে বলল, 'তুমি কি ব্যাপারটা কিছু বুঝলে?'

শারমিন বলল, 'কোন ব্যাপারটা?'

'ঐযে, শায়লা আপু ভালো লাগছে না বলে চলে গেল?'

শারমিন কিছু বলার আগেই একজন বলল, 'শায়লা আপুর এরকম মাঝে মাঝেই হয়। চলাফেরার মাঝে কোনো ব্যালেন্স নাই তো।'

শারমিন বলল, 'না, কিছুতো বুঝলাম না।'

আরেকজন তখন বলল, 'এখন এতকিছু বুঝে কাজ নাই। দুদিন পর সব বুঝবে।'

অন্য আরেকজন বলল, 'এসব বিষয় বাদ দে। এখন আমরা ওর সাথে কথা বলি।'

তারপর সবাই শারমিনের উপর ঝুঁকে পড়ল। ওর অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইল যা শারমিনের বলতে একদমই ভালো লাগছিল না তবুও ওকে বলতে হল। অনেকে ওর 'এ' প্লাস পাওয়ার রহস্য জানতে চাইল। প্রশ্নটা শুনে ও এতটা অবাক হল যে বলার মত না। 'এ' প্লাসের আবার রহস্য কি? ভালোভাবে পড়লেই তো 'এ' প্লাস পাওয়া যায়। আসলে ও গ্রামের স্কুল-কলেজ থেকে 'এ' প্লাস পেয়েছে। এজন্যই সবার এত কৌতুহল। ওদের ধারণা গ্রামের স্কুল-কলেজ থেকে 'এ' প্লাস পাওয়া যায় না।

একটা মেয়ে আবার ফাজিলের মত প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা, তুমি কি কখনো প্রেম করেছো?'

শারমিন একটু ইতস্তত করে বলল, 'না।'

আরেকজন বলল, 'তুমি টিভি বা সিডি দেখ?'

'দেখি।'

'এক্স দেখেছো কখনো?

শারমিন কোনো কথা বলতে পারল না। মাথা নিচু করে মুখ কাচুমাচু করতে থাকল। ওর এই অবস্থা দেখে সবাই এমনভাবে হাসতে শুরু করল যে লজ্জায় শারমিনের মরে যেতে ইচ্ছা করল!

শারমিনকে নিয়ে এভাবে আরো কিছুক্ষণ হাসাহাসি চলল। ওদের হাসির শব্দ শুনে শারমিনের চোখ ফেটে পানি বের হয়ে আসতে চাইছিল। ও নিজেকে বহুকষ্টে শান্ত রেখেছে। যোহরের আজানের সময় সবায় ওকে ছেড়ে দিল।

শায়লা আপুর রুম থেকে বেরিয়ে শারমিন তার নিজের রুমে গেল। ওর রুম চারতলায়। দোতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত উঠতে উঠতে ওর কেবলই মনে হল–হায়! এ আমি কোথায় এলাম? সবাই এমন কেন? ওর সবচেয়ে বড় চিন্তা হল এত হৈ চৈ ঠাট্টা-তামাশার মাঝে কেমন করে পড়াশোনা করবে। আর সবাই কি রকম বাজে বাজে কথা বলে, বাজে ইঙ্গিত করে যেন লজ্জা-শরম বিক্রি করে দিয়েছে। শারমিনের সবচেয়ে বড় ভয় হল শায়লা আপুকে নিয়ে। এই আপুটা একটু বেশিই ফাজিল। এই আপুটার কারণেই বাকিরা এত হৈ চৈ করার সাহস পায়। এসব ভেবে শারমিন বুঝে ফেলল এখানে থাকলে ও বেঁচে থাকতে পারবে না, মরে পেত্নী হয়ে যাবে!

কিন্তু চারতলায় পা দিয়ে শারমিন তার ভাবা বিষয়গুলো নিয়ে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল। চারতলাটা বেশ শান্ত মনে হল। সবচেয়ে বেশি অবাক করল বেশ কয়েকটি ঘর থেকে ভেসে আসা গুনগুন শব্দ। স্পষ্টই ওটা পড়ার শব্দ। ঘরের ভেতর মেয়েরা পড়ছে। নিচের হৈ চৈ তেমন একটা পাওয়া যাচ্ছে না চারতলায়। রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলে একটু শব্দও পাওয়া যাবে না। শুধু এটুকুই ওর ভেতরের সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিল।

এই নিয়মটা শায়লা আপুর। যারা ভালো পড়াশোনা করে তারা তিনতলার উপরে থাকবে। এবং যারা হৈ চৈ গোলমাল করতে পছন্দ করে তারা থাকবে তিনতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত। ইচ্ছে করলেই যে কেউ যে কোনো তলায় যেতে পারবে তবে নিচের মেয়েরা উপরে গিয়ে হৈ চৈ করতে পারবে না আর উপরের মেয়েরা নিচে এসে পড়াশোনা করতে পারবে না। এবং যারা পড়াশোনা ভালোভাবে করে তাদের কোনো ক্রমেই বিরক্ত করা যাবে না। শায়লা আপু সভা ডেকে এই নিয়ম করে দিয়েছে। নতুন যারা আসে তাদের হাতে এই নিয়মপত্র তুলে দেয়া হয় এবং এই নিয়মগুলো পালনে বাধ্য করা হয়। শারমিনের হাতেও নিয়মপত্র দিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু ও এখনো সেটা খুলে দেখে নি।

শারমিন নিয়মপত্রটা খোলার আগে খুব ভয় পাচ্ছিল না জানি কি সব লেখা আছে। কিন্তু সেটা খুলে পড়ার পর ওর চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। ও নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। নিয়মপত্রটা পড়ার পর ওর ভেতরের বাকি দুশ্চিন্তাটুকু দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে গেল এবং অনেকক্ষণ পর ওর বুকটা হালকা মনে হল। গোসল করে শারমিন নিচতলায় খেতে গেল।

এই মুহূর্তে শায়লা আপুর প্রতি শারমিনের শ্রদ্ধা জন্ম নিল। নিয়মপত্রের নিচে লেখা ছিল–আদেশক্রমে, শায়লা আপু। তবে শায়লা আপু খুব একটা ভালো মেয়ে না। বখে যাওয়া উচ্ছৃঙ্খল একটা মেয়ে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সবকিছু উপলব্ধি করে বলে সবার ভালোমন্দ শায়লা আপু একটু বেশিই বোঝে।

বিকেলে শায়লা আপু ছাদে বসে শারমিনের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলল। শারমিন শায়লা আপুর সব কথা মন দিয়ে শুনল। শায়লা আপুর বেশির ভাগ কথাই উপদেশ। শায়লা আপু সবচেয়ে জোর দিয়ে যে কথাটা বলল ওর আব্বু সেই কথাটা একটু সংকোচে বলে গেছেন। শায়লা আপু শারমিনকে বলল, 'ছেলেদেরকে খুব বেশি পাত্তা দিবি না। ছেলেরা নানা ভাবে তোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করবে, উত্যক্ত করবে। এসব ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবি। আর যদি জানতে পারে তুই বাইরে থেকে এসেছিস তাহলে তো কথাই নেই, সারাক্ষণ তোর পেছনে ঘুরঘুর করবে আর টীস্ করবে। এরকম যে কোনো সমস্যায় নিঃসংকোচে তুই আমাকে বলবি। আমার পাওয়ার সম্বন্ধে তুই জানিস না। আমি পার্টি করি। সুতরাং যে কোনো সমস্যায় আমার সাহায্য নিতে পারিস।'

শায়লা আপুর কথা শারমিনের ভালো লাগল। এবং শারমিনের মনে হল, মানুষটা আসলে খারাপ না। সে অযথা শায়লা আপুকে খারাপ মনে করেছে। শারমিন শায়লা আপুকে এই শহরে তার অভিভাবক মেনে নিল। তবে শায়লা আপুর কথাগুলো একটু দুশ্চিন্তায়ও ফেলল শারমিনকে। সত্যিই যদি ছেলেরা ওকে বিরক্ত করে তাহলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে কিভাবে, পড়াশোনা করবে কিভাবে? শারমিন নিজেকে খুব বেশি সুন্দরী ভাবে না তাই ও ধরে নিল ছেলেরা ওকে উত্যক্ত করবে না। তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল পানির মত। কিন্তু শারমিন জানে না জীবনটা এত সহজ নয়, ও জানে না শুধু সুন্দরীদেরই বখাটে ছেলেরা টীস্ করে না। সুন্দর একটা শারীরিক কাঠামো পেলেও বখাটেরা সন্তুষ্ট থাকে।

এক.

আজ শারমিনের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিন। স্কুল কলেজের পাঠ চুকিয়ে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শুরু হচ্ছে। সকাল থেকেই শারমিনের মন অস্থির। আজ যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে ঢুকবে তখন সেখানে তার পরিচিত কেউ থাকবে না। অজানা অচেনা পরিবেশে তাকে ক্লাস করতে হবে। হয়তো তার মত অনেকেই বাইরে থেকে পড়তে এসেছে কিন্তু প্রথম দিনেই তো তার সাথে পরিচয় হবে না। আর স্থানীয় মেয়েরা যদি তাকে কাছে না টানে, এসব ভেবে শারমিনের মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। এরকম অভিজ্ঞতা তার এর আগে কখনো হয় নি। আজ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীণ হতে হবে তাকে।

যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে রুটিন দেখে ক্লাসরুম খুঁজে বের করল শারমিন। ছাগল যেভাবে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে উঁকি দেয়, শারমিন ঠিক সেভাবে ক্লাসের ভেতরে একবার উঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর অভ্যাসবশত প্রথম বেঞ্চেই বসল। প্রথম বেঞ্চে আরো একজন বসে আছে। শারমিন চেষ্টা করল মেয়েটার একটু কাছাকাছি বসতে যদি পরিচয় হয়! শারমিনের মনের কথা বুঝতে পেরেই কিনা কে জানে মেয়েটা শারমিনের সাথে কথা বলতে শুরু করল।

'তোমার নাম কি?'

'শারমিন।'

'বাড়ি কোথায় তোমার?'

শারমিন তার গ্রামের বাড়ির নাম বলতেই মেয়েটা বলল, 'ও, তুমি বাইরে থেকে এসেছো!'

শায়লা আপু এই 'বাইরে থেকে আসা' কথাটার উপর বেশি জোর দিয়েছিল। এই মেয়েটাও সেটা ব্যবহার করল। কিন্তু এমন ভাবে বলল যেন বাইরে থেকে শহরে পড়তে আসাটা অপরাধ। শারমিনও অপরাধীর মত মাথা নিচু করে বসে থাকল।

মেয়েটা বলল, 'কি রেজাল্ট ছিল তোমার?'

'এ-প্লাস।'

মেয়েটা একটু অবিশ্বাসী ভাবে বলল, 'তাই!'

শারমিন শুধু উত্তর দিয়েই যাচ্ছে। এখনো কোনো প্রশ্ন করতে পারে নি। প্রশ্ন করতে গেলেই ওর গলায় আটকে যাচ্ছে। পাশের মেয়েটা আবার তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার আব্বু কি করেন?'

'ছোট-খাটো ব্যাবসা।'

'কিসের ব্যাবসা?'

শারমিনের এটা বলতে ইচ্ছে করছে না, তবুও বলল, 'ছোট একটা দোকান চালান।'

'ও।'

এবার শারমিন মেয়েটাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কি?'

'যুথি।'

'তোমার বাসা কোথায়?'

'এখানেই, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি দূরে না।'

'তোমার রেজাল্ট কি ছিল?'

'আমার রেজাল্ট খুব একটা ভালো ছিল না।'

'তবুও বলো।'

'থাক, শুনে লাভ নেই।'

যুথির এরকম উত্তরের পর শারমিন আর কোনো কথা বলল না। যুথিও না। দুজনই চুপ করে গেল। শারমিন চোখ ঘুরিয়ে ক্লাসটা একটু দেখার চেষ্টা করল। এখনো খুব বেশি ছাত্রছাত্রী আসে নি। একজন দুইজন করে ক্লাসে ঢুকছে। সবাই একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে। শারমিনের পাশে বসা যুথি নামের মেয়েটার কাছেও দুইজন এলো। সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে শুধু শারমিন ছাড়া।

শারমিন লক্ষ্য করল ক্লাস রুমটা একটু সাজানো। বুঝতে বাকি রইল না আজই নবীন বরণ হবে। কলেজের নবীন বরণে কত আনন্দ করেছে শারমিন, অথচ আজ সে চুপচাপ। ধীরে ধীরে ক্লাসে হৈ চৈ বাড়তে থাকল আর শারমিন নিজেকে আরো একাকী ভাবতে লাগল। যুথি তার দুই বান্ধবীর সাথে কথা বলছে অথচ শারমিনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না। যদিও পরিচয় হওয়ার পর শারমিন কি কথা বলবে তা নিয়ে বিপাকে পড়ে যেত তবুও এ অবস্থায় সে নিজেকে অসহায় ভাবতে শুরু করল।

একটা ঘন্টা পড়ার পর কয়েকজন ক্লাস রুমে প্রবেশ করল। তাদের কেউ স্যার-ম্যাডাম, কেউ বড় ভাইয়া-আপু। সবার হাতেই একটা করে কাগজ আর সবারই মুখ হাসি হাসি। বড় ভাইয়া আপুরা খুব ব্যস্ততার ভাব করছে। একজন আরেক জনকে কোনো কিছু আনতে বললে সে আবার আরেক জনকে বলছে। মোটামুটি একটা হৈ চৈ এর পর সব শান্ত হল। তারপর ডিপার্টমেন্টের হেড স্যার একটা বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন ঘোষণা করলেন। একে একে স্যার-ম্যাডাম ও বড় ভাইয়া-আপুরা বিভিন্ন ভাবে বক্তৃতা দিলেন। প্রথম বর্ষের সবাইকে লাল গোলাপ আর রজনীগন্ধা দিয়ে বরণ করা হল। প্রথম বর্ষের একজন বক্তৃতা করল। কয়েকজন গান, কৌতুক ও অভিনয় পরিবেশন করল। এভাবেই নবীন বরণ শেষ হয়ে গেল। শারমিন ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে কিন্তু এখানে আবৃত্তি করার সাহস পেল না। শুধু হা করে সব দেখল এবং শুনল।

আজ আর কোনো ক্লাস হল না। তিন ঘন্টা ধরে শুধু নানা রকম বক্তৃতা আর উপদেশ বিতরণ করা হল। অনেকটা নিরানন্দেই 'ফার্স্ট ডে অ্যাট ইউনিভার্সিটি' কাটলো শারমিনের। তারপর ফিরে এলো মেসে।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে শারমিন প্রথম বেঞ্চে বসল। বেঞ্চে আগে থেকেই বসে থাকা দুইজনের সাথে শারমিনের পরিচয় হল। ওরাও স্থানীয়। যুথি নামের মেয়েটাকে ক্লাসে ঢুকতে দেখে শারমিন একটু হাসল। যুথিও শারমিনকে দেখে একটু হেসে বলল, 'কি খবর? কেমন আছ?'

'ভালো। তুমি?'

'আছি কোনোরকম!'

শারমিন ভেবেছিল যুথি ওর পাশেই বসবে। তাই একটু সরে গিয়ে জায়গা ফাঁকা করে দিল। কিন্তু যুথি শারমিনের পাশে না বসে পিছনে ওর বান্ধবীদের সাথে বসল।

ঘন্টা পড়ার পর একজন মোটাসোটা ম্যাডাম ক্লাসে আসলেন। ম্যাডাম ক্লাসে এসে সবার প্রথম যে কাজটি করলেন তা হল, সবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'কেমন আছ তোমরা? ভার্সিটি কেমন লাগছে?'

সবাই চিৎকার করে বলল, 'ভালো ম্যাডাম।'

দুষ্টুমত একটা ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'ম্যাডাম, একটা কথা বলতে পারি?'

'কেন নয়?' ম্যাডাম তাঁর চোখ দুটো কপালে তুলে ফেললেন, 'অবশ্যই বলবে। আজ আমরা সবাই মিলে অনেক কথা বলব, মজা করব। তুমি বলো কি বলবে।'

'ম্যাডাম, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।'

ক্লাসের সবাই খিল খিল করে হেসে উঠল। ম্যাডামের মুখের হাসিও অনেক বিস্তৃত হল। তিনি তাঁর হাসি আরো বিস্তৃত করে বললেন, 'থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

'ওয়েলকাম ম্যাডাম।' বলে ছেলেটা বসে পড়ল।

ম্যাডাম মুখটা হাসি হাসি রেখেই বললেন, 'শোনো সবাই, আমি আজকেই প্রথম তোমাদের ক্লাসে এসেছি। আজ তোমাদের সাথে পরিচিত হব, গল্প করব। আজ কোনো পড়াশোনা হবে না, পড়াশোনা শুরু হবে পরের ক্লাস থেকে। তোমরা রাজি?'

সবাই চিৎকার করে বলল, 'জ্বি ম্যাডাম।'

ম্যাডাম প্রথমে লম্বা একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। এসব বক্তৃতার বেশির ভাগ অংশ জুড়েই থাকে উপদেশ। ম্যাডামের বক্তৃতায় আবার বেশির ভাগই নিষেধ। বক্তৃতা শেষে ম্যাডাম বললেন, 'তোমরা এখানে মোটামুটি ৭০-৮০ জন আছ। একদিনেই তো আর তোমাদের সবার সাথে পরিচিত হওয়া যাবে না তবুও তোমরা সবাই তোমাদের নাম আর বাড়ির ঠিকানা বলো। যদিও সবার নাম শোনার পর দুইজনের নাম বলতে পারবো বলে মনে হয় না, তবুও বলো।'

একপাশ থেকে তখন একে একে সবাই নাম বলা শুরু করল। শাহেদ আর রুমেল অনেকক্ষণ ধরে শারমিনকে লক্ষ্য করছিল। ক্লাসের কার নাম কি বাড়ি কোথায় এসবে ওদের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু শারমিন যখন ওর নাম আর বাড়ির ঠিকানা বলছিল তখন ওরা কান পেতে শুনেছে।

শাহেদ বলল, 'শারমিন, খুব সুন্দর নাম।'

রুমেল বলল, 'মেয়েটাকে তোর সত্যিই ভালো লেগে গেছে? দেখতে তো তেমন ভালো না।'

'তোকে সেটা ভাবতে হবে না। আমার ভালো লেগেছে ব্যাস।'

'ওকে।'

ম্যাডাম যদিও বলেছিলেন গল্প করবেন কিন্তু তাঁর কথায় গল্পের কোনো চিহ্ন ছিল না। ক্লাসের পুরো সময় জুড়ে তিনি উপদেশের নামে নিষেধ করে গেলেন। আর সবাই হা করে সেগুলো শুনলো কিন্তু কোনোদিন সেগুলো মানবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে! এভাবে প্রথম ক্লাসটা শেষ হল।

প্রথম ক্লাসের পর দেড় ঘন্টা আর কোনো ক্লাস নেই। শারমিন এই দেড় ঘন্টা কি করবে বুঝতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত শারমিন ঠিক করল বিশ্ববিদ্যালয়টা ঘুরে দেখবে। দুই-একজন সঙ্গী পেলে ভালো হত কিন্তু কাউকে পেল না। যুথি এবং আজকে নতুন যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে তারা সবাই নিজ নিজ মত করে আড্ডা দিতে লাগল। তাদের মাঝে নিজেকে খুব বেমানান মনে হচ্ছে শারমিনের। তাই সে একাই হাঁটতে শুরু করল। শারমিনের পিছু নিল শাহেদ আর রুমেল। শারমিন প্রথমে বুঝতে পারে নি শাহেদ আর রুমেল ওর পেছন পেছন

আসছে। শারমিন যখন একটা নির্জন রাস্তায় এলো তখন লক্ষ্য করল তার পেছনে দুটো ছেলে। এ পর্যন্ত সে যতবার পেছনে তাকিয়েছে ততবারই এই দুটো ছেলেকে দেখেছে। শারমিন আগে বোঝে নি এই দুইজন তার পেছন পেছন আসছে। এই রাস্তাটা অনেকটা ফাঁকা ও নির্জন। এখানেও ছেলে দুটো তার পেছনে পেছনে আসছে। শারমিনের বুঝতে বাকি রইলো না ছেলে দুটো ওকেই ফলো করছে। শারমিন সামনে যাওয়ার আর সাহস পেল না। সে পেছনে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। ছেলে দুটোও সামনের দিকে আসছে। ওরা দিক পরিবর্তন করে নি। ছেলে দুটোকে পাশ কাটিয়ে চলে আসার আগ পর্যন্ত শারমিনের বুক কাঁপছিল। ছেলে দুটোকে পাশ কাটিয়ে আসার সময় ওদের কথাবার্তা একটু শুনতে পেয়েছে শারমিন। পড়াশোনা নিয়ে কথা বলছিল ছেলে দুটো। শারমিনের এবার ভয় কাটলো। তার মনে হল অহেতুক সে ভয় পেয়েছে। ছেলে দুটো হয়তো ওদিকেই যাচ্ছিল। শারমিন নির্ভয়ে হাঁটা শুরু করল।

শারমিন খানিকটা দূরে চলে যাবার পর রুমেল শাহেদকে বলল, 'মেয়েটা মনে হয় বুঝে ফেলেছেরে।'

'বুঝলে বুঝছে। আমরা তো ওর পেছনেই ঘুরছি। এটা বুঝতে পেরে যদি কথা বলতে আসে তাতে আমাদেরই লাভ। আয় ঘুরি।'

ওরা ঘুরে আবার শারমিনের পেছনে হাঁটা শুরু করল।

হঠাৎ শারমিনের মনে হল আবার দুজন ওর পেছনে পেছনে আসছে। মাথা ঘুরিয়ে দেখে ওই ছেলে দুটো। এবার একটু বেশি ভয় পেয়ে যায় শারমিন। শারমিনের মনে প্রশ্ন জাগে–ছেলে দুটোকে তো সে চেনে না, তবে কেন ওরা তার পিছু নিয়েছে? শারমিন দ্রুত পা চালিয়ে ডিপার্টমেন্টের সামনে চলে আসে।

ডিপার্টমেন্টের সামনে আসতেই তিন-চারজন ছেলে শারমিনের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে নাম কি, বাড়ি কোথায়, এখানে কোথায় থাকে এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। শারমিন এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিল। সে ছেলেগুলোকে চেনে না তারপরও উত্তর দিল। কিন্তু নিজে কোনো প্রশ্ন করতে পারল না। দূর থেকে শাহেদ আর রুমেল বিষয়টা লক্ষ্য করল।

ছেলেগুলোর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে আরেকটু সামনে যেতেই আরো দুইজন শারমিনের সামনে দাঁড়াল। তারপর কথা বলতে শুরু করল। একজন বেশ লম্বা, হালকা-পাতলা, ফর্সা এবং মুখটা ইঁদুরের মত ছুঁচালো। এই ছেলেটার চুলও বেশ লম্বা। আরেকজন একেবারে কালো কুচকচে, মাথা ন্যাড়া এবং বাটু। কালো মুখে কালো সানগ্লাস, দেখতে একেবারে হনুমানের মত লাগছে। ওকে যদি চিড়িয়াখানায় হনুমানের খাঁচায় রাখা হয় তবে মানুষ তো নয়ই খাঁচার হনুমানগুলোও এতটুকু আপত্তি করবে বলে মনে হয় না!

একটু আগের ছেলেগুলোর কথার সাথে এদের কথার অনেক মিল। একই রকমভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল আর শারমিন উত্তর দিয়ে গেল। এদের চেহারা দেখে এবং কথা বলার ভঙ্গিতে শারমিনের বমি করার মত অবস্থা। কোনো রকমে ছাড়া পেলে বাঁচে। যদিও শারমিন বুঝতে পারছে না কেন এরা ওকে এইসব প্রশ্ন করছে আর কেনই বা সে উত্তর দিচ্ছে। ঠিক তখন একটা প্রশ্ন শারমিনকে বেশ বিব্রত করল।

'আপু আপনাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমরা আপনার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই। আপনি কি আমাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবেন?'

এই প্রশ্ন শুনে শারমিন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। এভাবে ডেকে-হেঁকে কেউ ফ্রেন্ডশিপ করে শারমিন নিজে না দেখলে কোনোদিন বিশ্বাস করত না। উত্তরে সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। একটু ইতস্তত করে বলতে চাইল, 'দেখুন আমি এখানে নতুন এসেছি–'

শারমিন কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই ইঁদুরের মত দেখতে লম্বা চুলের ছেলেটা বলল, 'সেজন্যই তো বলছি, আপনাকে অনেকে বিরক্ত করবে। একটু আগেই দেখলাম কয়েকজন আপনাকে বিরক্ত করছে। আপনি যদি আমাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করেন তাহলে আর

কেউ আপনাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না। আমরা লোকাল ছেলে। আপনি যদি আমাদের বান্ধবী হন তাহলে কারো বাবার ক্ষমতা নাই আপনাকে বিরক্ত করে।'

শারমিন একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলল, 'আপনারাও কি আমাকে বিরক্ত করছেন না?'

'ছি, ছি, আপু আপনি ব্যাপারটা এভাবে দেখছেন কেন? আমরা আপনার ডিপার্টমেন্টেই পড়ি। আপনি বাইরে থেকে এসেছেন, আপনার ভালো-মন্দ দেখা লোকাল ছেলে হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব।'

'ভালো-মন্দ দেখার জন্য আমার গার্জিয়ান আছে।'

'তবুও ডিপার্টমেন্টে কোনো সমস্যা হতে পারে।' ইঁদুরের মত দেখতে লম্বা চুলের ছেলেটা এমন ভাবে কথাটা বলল যেন কার কোথায় কি সমস্যা হতে পারে সে ব্যাপারে সে বিশেষজ্ঞ।

শারমিনও ছেলেটাকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'সেজন্য স্যার-ম্যাডামরা আছেন।'

'তারপরও সমস্যা হতে পারে।' ছেলেটা এমনভাবে বলল যেন শারমিনের সমস্যা হবেই আর সে সমস্যা সমাধানের জন্য ছেলেটাকে তার লাগবেই।

শারমিন তবুও পাত্তা দিল না, সাহসের সাথে বলল, 'সেটা আমি বুঝবো। আপনাদের এত কষ্ট করতে হবে না।'

'তার মানে আপনি আমাদের অফার ফিরিয়ে দিচ্ছেন?' ইঁদুরের মত ছেলেটা বেশ ভারী গলায় বলল।

শারমিন তাতে একটুও বিচলিত হল না, সহজ গলায় বলল, 'জ্বি।'

ছেলেটা এবার একটু রাগী রাগী গলায় বলল, 'আপনি কিন্তু কাজটা ভালো করছেন না। আমরা জাস্ট আপনার সাথে–'

শারমিন ছেলেটাকে হাতের ঈশারা করে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার ভালো-মন্দ আপনাকে বুঝতে হবে না। আমারটা আমি বুঝবো।'

শারমিন নিজের সাহস দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

'হুঁহ! বাইরে থেকে এসেছেন এত গরম দেখাবেন না। একেবারে ঠান্ডা করে দেব। মনে রাখবেন আমরা লোকাল ছেলে।'

কথাটা শুনে শারমিনের মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সে আর কোনো কথা না বলে চলে এলো ডিপার্টমেন্টের ভেতরে।

ইঁদুরের মত ছেলেটা পেছন থেকে একটু উঁচু স্বরে বলল, 'কাজটা কিন্তু ভালো হল না।'

এসব ছেলেরা কিভাবে প্রথমে বান্ধবী, পরে প্রেমিকা এবং তারপর সর্বনাশ করে পালিয়ে যায় তার বর্ণনা শারমিনকে শায়লা আপু দিয়ে রেখেছে। তাই ছেলেগুলোর কথায় একটুও পাত্তা দেয় নি শারমিন। ওদের সাথে কথা বলার সময় শারমিনের নিজেকে সাহসী মনে হচ্ছিল। কিন্তু ওদের শেষ কথাগুলো তার সেই সাহসের পুরো জায়গাটা নিয়ে নিল ভয়, আতঙ্ক। শারমিন খুব ভয় পেয়ে গেছে। ওর খুব কান্না পাচ্ছে।

শারমিন যখন ছেলেগুলোর সাথে কথা বলছিল তখন শাহেদ আর রুমেল দূরে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। শাহেদ আর রুমেল বুঝতে চেষ্টা করছিল ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। দূর থেকে ভালোভাবে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও অন্তত এইটুকু বুঝতে পারলো ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

'কি বুঝলিরে শাহেদ?'

'কি আবার বুঝবো? শুয়োরের বাচ্চাগুলো যে শারমিনকে বিরক্ত করছে সেটা তো স্পষ্ট।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা রুমেল বলতো, এই শুয়োরের বাচ্চাদের ভেতর কি আছে? কালকেও দেখেছি এভাবে বেশ কয়েকটা মেয়ের সাথে কথা বলছে। তুই আর আমি তো পারি না।'

'আমি কি জানি। আমি তো ওদের সাথে মিশি নি।'

'তুই-ই বল এভাবে বিরক্ত করা কি ঠিক? মেয়েটা বাইরে থেকে এখানে পড়তে এসেছে। ওকে বিরক্ত করা তো আরো অন্যায়।'

'তুইও তো কম না। কালকেও একবার পিছে পিছে ঘুরেছিস আজকেও ঘুরলি।'

'কিন্তু আমি কি ওকে বিরক্ত করেছি?'

'অবশ্যই করেছিস। ওরা সামনে থেকে বিরক্ত করছে আর তুই পিছন থেকে করছিস। একই ব্যাপার।'

'মোটেই না।'

'শোন, বাইরে থেকে আসা কোনো মেয়ের পেছনে যদি তোর আর আমার মতো দুইটা অপরিচিত ছেলে ঘুর ঘুর করে তাহলে মেয়েটার মনে একটা অস্বস্তিবোধ জন্ম নেয়। পথ আগলে কথা বলে বিরক্ত করা যদি অন্যায় হয় তবে মেয়েটাকে এই অস্বস্তির মাঝে ফেলাটাও অন্যায়।'

'ওরে বাবা, দার্শনিক হয়ে গেলি দেখছি।'

'এসব বুঝতে দার্শনিক হওয়া লাগে না। নিজেদের জীবনের দিকে তাকালেই হয়। আমার নিজের একটা বোন আছে। এটা দিয়েই আমি বিষয়টা উপলব্ধি করেছি।'

'তার মানে পেছনে ঘোরা কাজটা ঠিক হচ্ছে না?'

'না।'

'কিন্তু ওরা যে বিরক্ত করেছে!'

'ওরা করছে বলে যে আমাদেরকেও করতে হবে এরকম তো কোনো নিয়ম নাই। তবে এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করা দরকার।'

'কিন্তু কি করবো?

'শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে সাইজ করতে হবে।'

'কিন্তু কাজটা কি ঠিক হবে? যদি আবার ঝামেলা পেকে যায়?'

'সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক না তবে সাবধানে কাজ করলে সবকিছু সামলানো অসম্ভব কিছু না।'

'ঠিক আছে, আগে কয়েকদিন দেখি কী হয়। তারপর একটা কিছু করা যাবে। এখন চল, দেখি শারমিন কোথায় গেল।'

'তবে তোকে একটা কথা বলে রাখি।' রুমেলের কথা শুনে শাহেদ একটু অবাক হল।

'কি কথা?'

'শারমিনকে তোর সত্যিই ভালো লেগেছে?'

'মিথ্যা-মিথ্যি আবার কখনো ভালো লাগে নাকি?'

'না-মানে, বলছিলাম যে, কি রকম ভালো লেগেছে?'

'অনেক অনেক ভালো লেগেছে এবং তোকে সেটা বোঝানো যাবে না।'

'ঠিক আছে, আমাকে বোঝাতে হবে না। শুধু তুই জেনে রাখ, তোর যেমন ওকে ভালো লাগার অধিকার আছে ওরও তেমন তোকে ভালো না লাগার অধিকার আছে। ও যদি তোকে প্রত্যাখ্যান করে তবে তুই যেন আবার উল্টাপাল্টা কিছু করে বসিস না।'

শাহেদ একগাল হেসে বলল, 'মেরে পিয়েরে দোস্ত, আমার মাথায় এসব জ্ঞান আছে। আমাকে জ্ঞান দিতে গিয়ে তোমাকে আর মাথার চুল পাকাতে হবে না। এখন চলো ওদিকে যাই।'

'ঠিক আছে চল্। তবে যা বললি তা যেন স্মরণ থাকে। আমি কিন্তু এসব ব্যাপারে উল্টাপাল্টা কিছু সহ্য করবো না।'

'ওকে, ওকে!'

শারমিন ক্লাস রুমের সামনে এসে দেখে সেখানে অন্য ইয়ারের ক্লাস হচ্ছে। ক্লাস রুমের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। শাহেদ আর রুমেলকে আসতে দেখে শারমিন ভয় পেল। এই দুটো ছেলেই তো একটু আগে ওর পেছনে ঘুরছিল। এরাও যদি কিছুক্ষণ আগের ছেলেদের মত

করে কথা বলে এই ভয়ে ওর ভেতরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু শারমিন দেখল ছেলে দুটো কাছে এলো না, দূরে দাঁড়িয়ে একটু পরপর ওর দিকে তাকাতে লাগলো। শারমিনের খুব অস্বস্তিবোধ হল। আজকে আর ওর ক্লাস করতে মন চাইলো না। ওর ভেতরে প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্ক ঢুকে গেছে। এই শহরে ওর আপন বলতে কেউ নেই। একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেলে ওকে দেখার কেউ নেই এই শহরে। এটাই ওর সবচেয়ে বড় আতঙ্কের কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে মেসে আসার আগ পর্যন্ত শারমিন ভয়ে কাঁপছিল। ওর মনে হচ্ছিল ছেলেগুলো রাস্তাতেও ওকে বিরক্ত করবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। শারমিন মেসে ফিরে ঘরের দরজা লাগিয়ে বসে থাকল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল শায়লা আপুকে বিষয়টা বলে রাখবে কিন্তু ওর খুব লজ্জাও লাগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় দিনেই এরকম সমস্যা। এ কথা বলতে ইচ্ছে করলেও লজ্জায় শারমিন কাউকে কিছু বলতে পারল না।

দুই.

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়েছিল শনিবার। আজ আবার সপ্তাহ ঘুরে শনিবার এসেছে। এর মধ্যে রবিবার ছাড়া আর একদিনও ক্লাসে যায় নি শারমিন। ওর ভেতর একটা আতঙ্ক ভর করেছে। রোজ রাতেই সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। একদল নেকড়ে ওকে তাড়া করছে। শারমিন প্রাণপণে ছুটতে থাকে কিন্তু নেকড়েগুলোর সাথে পেরে ওঠে না, ওর কাছাকাছি চলে আসে। যত জোরে দৌড়াতে চেষ্টা করে তত সে পিছিয়ে পড়ে। একসময় নেকড়েগুলো ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শারমিনের ঘুম ভেঙে যায়। লাফিয়ে ওঠে সে, দরদর করে ঘামতে থাকে। আতঙ্ক ভর করে ওর মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে না ভয়ে, ঐ ছেলেগুলোর ভয়ে যে ছেলেগুলো বলেছিল ওকে ঠান্ডা করে দেবে।

কিন্তু আর কতদিন এভাবে থাকবে শারমিন! লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারে না সে। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে–তার এভাবে ভয় পাওয়া ঠিক কিনা। এভাবে ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকলে বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবে কেমন করে? নিজের মনকে বোঝাল শারমিন–সে ভয় পাবে না। সে তো কোনো অন্যায় করে নি, তবে কেন সে ভয় পাবে? নিজের মনে নিজেই সাহস জোগাল শারমিন। ক্যাম্পাসে যাবে ঠিক করল। যে ছেলেই কথা বলতে আসুক, যাই জিজ্ঞেস করুক কিছুই উত্তর দেবে না, কোনো কথা বলবে না ঠিক করল সে। তারপর রওনা হল ক্যাম্পাসে।

পথে আসার সময় ও নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু তবুও ওর ভয়টা বারবার জেগে উঠতে চাইছে। শারমিন চাইছে ও একটুও ভয় পাবে না কিন্তু পারছে না। বারবার ওর মনে পড়ে যাচ্ছে ছেলেগুলোর মুখ আর এতেই ওর সাহসের গুড়ে বালি পড়ে যাচ্ছে। তবুও সে আজ পণ করেছে ক্যাম্পাসে যাবেই, যে করেই হোক ভয় চেপে রাখবে। শুধু এইটুকুর জোরেই সে ক্যাম্পাসে হাজির হল।

রিক্সা থেকে নামতেই অবশ্য ওর সাহসে ধাক্কা লাগল। সেদিনের ছেলে দুটো যে গেটেই দাঁড়িয়ে আছে! শারমিন নিজের ভেতর সাহস সঞ্চার করল, নিজেকে শক্ত করল। রিক্সা ভাড়া দিয়েই সে তার ডিপার্টমেন্টের দিকে হাঁটা শুরু করল। ছেলে দুটো শারমিনের পাশে দাঁড়াল তারপর ওর সাথে সাথে হাঁটাতে শুরু করল।

গতদিন শুধু ইঁদুরের মত ছেলেটা কথা বলেছে, হনুমানের মত ছেলেটা চুপ ছিল। আজকেও হনুমানের মত ছেলেটা চুপ। ইঁদুরের মত ছেলেটা বলল, 'কি ব্যাপার, এই কয়দিন আসো নি কেন?'

অন্যদিন হলে শারমিন এখনি ভয় পেয়ে যেত। গতদিন আপনি করে বলেছিল আজ সরাসরি তুমি। কিন্তু সে আজ পণ করেছে ভয় পাবে না। সে চুপচাপ হাঁটতে থাকল।

ইঁদুরের মত ছেলেটা আবার প্রশ্ন করর, 'কি হল, কথা বলছো না যে! এই কয়দিন কেন আসো নি?'

শারমিন এবারও কোনো কথা বলল না।

'কি হল, বোবা হয়ে গেলে নাকি?'

শারমিন কোনো কথাই বলল না। ডিপার্টমেন্টের দিকে হাঁটতে থাকল।

'দেখো, আমার মেজাজ কিন্তু চটে যাচ্ছে। কথা বলো।'

শারমিন এবারও কোনো কথা বলল না। গেট থেকে ওর ডিপার্টমেন্টে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে। আজ এই পাঁচ মিনিট ওর কাছে পাঁচ ঘন্টা মনে হচ্ছে। পথ যেন শেষই হতে চায় না। ক্লাসে যেতে পারলেই ও স্বস্তি পায়। ঠিক এই মুহূর্তে ছেলেটা যা করল তার জন্য শারমিন একটুও প্রস্তুত ছিল না। ছেলেটা শারমিনের হাত ধরে ফেলল। থমকে দাঁড়াল শারমিন। এখন কি করবে সে! এটা তো ভেবে আসে নি! ওর ধারণা ছিল ওরা শুধু কথা বলবে কিন্তু রাস্তার মধ্যে এভাবে হাত ধরে ফেলবে সেটা শারমিনের কল্পনাতেও ছিল না। ছেলেটা কঠিন গলায় বলল, 'কি, কথা বলবে না?'

শারমিন তবুও কথা বলল না। তার হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। দূর থেকে শাহেদ আর রুমেল দৃশ্যটা দেখল। শারমিনও শাহেদ আর রুমেলকে দেখতে পেল। শারমিন আবারও ধাক্কা খেল। ওরাও তো তার পিছে পিছে ঘুরছে। ওরাও যদি এরকম একটা কিছু করে বসে! শারমিনের এখন সেটা ভাবার সময় নেই। রাস্তার মধ্যে একটা ছেলে তার হাত ধরে আছে এবং সে হাত ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে। সোজা বাংলায় তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলছে। ব্যাপারটা সে কখনো কল্পনা করতে পারত না। তার চোখ ফেটে পানি বের হয়ে আসতে চাইলো, চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল কিন্তু সে চিৎকার দিতে পারল না, কাঁদতেও পারল না। শরীরে যথেষ্ট জোর এনে, চোখ-মুখ শক্ত করে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল। শারমিনের মুখায়বের কাঠিন্যেই হোক কিংবা আশেপাশের লোকজনের কথা ভেবেই হোক ইঁদুরের মত ছেলেটা শারমিনের হাত ছেড়ে দিল। শারমিন ডিপার্টমেন্টের দিকে জোরে হাঁটতে শুরু করল। পারলে সে দৌড় দেয়। ছেলে দুটোও শারমিনের পেছনে পেছনে গেল।

শাহেদ খুব রেগে গেছে। সে ছেলে দুটোকে মারতে উদ্যত হল। রুমেল তাকে থামাল।

শাহেদ চিৎকার করে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চাদের কাণ্ড দেখলি? রাস্তার মধ্যে মেয়েটার হাত ধরে ফেলল। শারমিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিস? কেমন অসহায় ভাব। আর তুই আমাকে চুপ করতে বলছিস, শান্ত হতে বলছিস? এটা তুই বলতে পারছিস রুমেল? তোর না একটা বোন আছে?'

'হ্যাঁ শাহেদ, আমি সব ভেবেই তোকে শান্ত হতে বলছি। তুই যদি এখন একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিস, মারামারি করিস তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। মেয়েটা আর মুখ দেখাতে পারবে না।'

'তাই বলে শুয়োরের বাচ্চাগুলো এভাবে ওকে বিরক্ত করবে? সেদিনও বোধহয় এরকম কিছু একটা করেছিল। সেজন্যই হয়তো শারমিন চারদিন ক্যাম্পাসে আসে নি। বল, এটা মেনে নিবি?'

'এটা মেনে নিচ্ছে কে? আমি তোকে এখন শান্ত হতে বলছি। এখানে এই ক্যাম্পাসে এই মুহূর্তে কিছু করা যাবে না। যা করতে হবে ভেবে চিন্তে ঠান্ডা মাথায় করতে হবে। এখন ক্লাসে চল, শুয়োরের বাচ্চাগুলো তো আবার পেছনে পেছনে গেল।'

রাগে গরগর করতে করতে শাহেদ রুমেলের সাথে ক্লাসে গেল।

শারমিনের ক্লাসে আসতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। ফার্স্ট বেঞ্চে জায়গা নেই। মাঝের দিকের একটা বেঞ্চ ফাঁকা আছে আর সে বেঞ্চে যুথি বসে আছে। যুথিকে দেখে শারমিন জানে পানি ফিরে পেল। যুথি যে বেঞ্চে বসে আছে তার পরের দুই বেঞ্চ ভর্তি, কোনো জায়গা নেই। যুথির পাশে বসলে ছেলেগুলো আর শারমিনের নাগাল পাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে একসাথেই বসে। পেছনের দিকে বসলে ছেলেগুলো ক্লাসেও ডিস্টার্ব করবে। তাই হাসি হাসি মুখ

করে শারমিন নিরাপদ জায়গা যুথির পাশে বসতে গেল যাতে ছেলেগুলো তার আশেপাশে বসতে না পারে। কিন্তু যুথির পাশে বসতেই সে শারমিনের মাথায় আকাশ ভেঙে দিল।

'আরে আরে, এখানে বসো না। আমার বান্ধবীরা আসবে। ওদের জন্য জায়গা রেখেছি। তুমি অন্য জায়গায় বসো।'

শারমিন জানে না এভাবে কারো জন্য জায়গা রাখা যায় কিনা। ও কখনো কারো জন্য এভাবে জায়গা রাখে নি, ওর জন্যও কেউ রাখে নি। শারমিনের উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। এখান থেকে উঠলেই ওকে পেছনে বসতে হবে। ছেলেদের মধ্যে ও বসতে পারবে না তাই ওকে একেবারে পেছনেই বসতে হবে। আর তাহলেই ছেলেগুলো সুযোগ পেয়ে যাবে। শারমিন যুথিকে নরম স্বরে বলল, 'আমি বসি? চার-পাঁচজন তো বসা যায়।'

'আরে, পেছনে জায়গা আছে তো! জায়গা না থাকলে না হয় কথা ছিল। প্লিজ এখানে বসো না।'

শারমিনের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ব্যাপারটা যুথিকে খুলে বলবে। কিন্তু হঠাৎ যুথির উপর শারমিনের খুব রাগ হল। শারমিন দাঁতে দাঁতে চেপে সেখান থেকে উঠে গেল। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখে পেছনের দিকের বেঞ্চগুলো ছাড়া আর কোনো জায়গা নেই। ছেলে দুটো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শারমিন বসলেই ওরা সুযোগ বুঝে বসে পড়বে। শাহেদ আর রুমেলও বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে দুটো কি করে তা দেখার জন্য ওরা অপেক্ষা করছে। শারমিন ঠিক বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। কিন্তু ওর কিছুই করার থাকল না। লম্বা দাঁড়িওয়ালা একটা স্যার ক্লাসে ঢুকল। শারমিন তড়িঘড়ি করে পেছনের একটা বেঞ্চেই বসল। তার দুপাশে আরো দুইটা মেয়ে বসল। আর ছেলে দুটো বসল ঠিক শারমিনের পেছনে। শাহেদ আর রুমেল বসল ছেলে দুটোর পেছনে।

ছেলে দুটো শারমিনের পেছনে বসতেই সে আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারল না। ভয়ে ওর বুক কাঁপতে লাগল। একটু আগে রাস্তার মধ্যে ওরা শারমিনের হাত ধরেছে। এবার না জানি কি করে। এসব ভাবতেই ওর ভেতরটা আতঙ্কে ভরে যায়। কিন্তু শারমিন তার ভাবনাগুলোও সম্পূর্ণ করতে পারলো না। ইঁদুরের মত দেখতে লম্বা চুলের ছেলেটা নোংরামির আরো একধাপ এগিয়ে সরাসরি শারমিনের গায়ে হাত দিল। শারমিনের পিঠে থাবা দিয়ে ইঁদুরের মত ছেলেটা বলল, 'অ্যাই, স্যারের নামটা কি জানো?'

শারমিন লজ্জায়-আতঙ্কে সংকুচিত হয়ে যায়। সে পেছনে তাকায় না, প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

ছেলেটা আবার শারমিনের পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, প্রশ্ন করলে যে উত্তর দিতে হয় এই ভদ্রতা তোমাকে কেউ শেখায় নি?'

শারমিন অবাক হয়ে যায়, এরা ওকে ভদ্রতা শেখাচ্ছে! এরকম অভদ্র আচরণ করে ওকে ভদ্রতা শেখাচ্ছে! শারমিন এবারও কোনো কথা বলে না। ওর পাশে আরো দুটো মেয়ে বসে আছে। ওরা না থাকলে হয়তো ছেলে দুটো শারমিনের পাশে গিয়েই বসতো।

পেছন থেকে শাহেদ আর রুমেল সব দেখছে। শাহেদ দাঁত কিড়মিড় করছে। রুমেল শাহেদের হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলছে, 'দোস্ত, বিষয়টা আমারও সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু দেখ্ এখানে কিছু করিস না। রাগটা সামলে নে।'

শাহেদ কোনো কথা বলে না। সে রাগে ফুঁসতে থাকে। আর ওকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছে রুমেল। ঠিক এই সময় ইঁদুরের মত দেখতে লম্বা চুলের ছেলেটা বেঞ্চের নিচ দিয়ে শারমিনকে নানা রকম অশ্লীল ইঙ্গিত করতে থাকে, ওড়না ধরে টান দেয়, বেঞ্চের নিচ দিয়ে শারমিনের স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দেয়ার চেষ্টা করে। শারমিন ছিটকে সরে যায়। ও নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে ওর সাথে এরকম আচরণ করা হচ্ছে। পাশের মেয়ে দুটো বুঝতে পেরেছে আসলে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। স্যারের কথা শুনতে লাগল।

শারমিন বেঞ্চের উপর মাথা দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ও স্যারকে বলতে চাচ্ছে কিন্তু কি বলবে, কেমন করে বলবে এই লজ্জার কথা? এতগুলো ছেলেমেয়ের সামনে এই কথা কিভাবে স্যারকে বলবে শারমিন তা ভেবে পায় না। সে কাউকে কিছু বলল না। ইঁদুরের মত দেখতে ছেলেটা শারমিনের পিঠে খামচি দিয়ে বলল, 'কি, বলেছিলাম না বেশি গরম দেখালে ঠান্ডা করে দেব। এখন কেমন লাগছে?'

শারমিনের ইচ্ছে হল ছেলেটার গালে একটা চর বসিয়ে দেবে। কিন্তু পারল না। বেঞ্চের উপর মাথা রেখে কাঁদতে থাকল।

শাহেদ-রুমেল আর কিছু দেখতে পারে না। ওদের গা গুলিয়ে আসে। ওরা চোখ বন্ধ করে ফেলে। শাহেদ ভাবে, সে নিজে একটা ছেলে। সে তো কখনো কোনো মেয়ের সাথে এরকম আচরণ করতে পারবে না। তাহলে ঐ ছেলেটা কেন পারছে, কিভাবে পারছে! কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারে না শাহেদ। রুমেল ভাবে, তার নিজের একটা বোন আছে। চোখের সামনে যদি ওর বোনের এ অবস্থা দেখতো তবে কি সে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারতো, চুপ করে বসে থাকতে পারতো! রুমেলও এ হিসাব মেলাতে পারে না। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে।

ক্লাস শেষে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এলো শারমিন। বেরিয়ে এলো ছেলে দুটো, বেরিয়ে এলো শাহেদ আর রুমেল। ছেলেগুলো ধরার আগেই শারমিন ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে রিক্সা নিতে চায়। ছেলেগুলোও আর তাড়াহুড়া করে না। যেতে দেয় শারমিনকে।

শাহেদের ইচ্ছা হল ইঁদুরের মত দেখতে ছেলেটার মাথা ফাটিয়ে দেবে। রুমেল এবারও শাহেদকে শান্ত করল। কেন করল সে নিজেই জানে না। তার শুধু মনে হচ্ছে রাগের মাথায় কিছু করে বসলে শারমিনেরই ক্ষতি। অনেক কষ্টে সে শাহেদকে শান্ত করল। কিন্তু কারোরই মন মানছে না। মেয়েটার জন্য ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে। ওরা নিজেরাও বখাটের মত শারমিনের পেছনে পেছনে ঘুরেছে কিন্তু ওদের মনে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।

তিন.

শারমিন মেসে ফিরে এসে রুমের দরজা লাগিয়ে দিয়ে দুপুর পর্যন্ত বসে কাঁদল। ওর কাছে ক্যাম্পাসের সময়টুকু ঘুমের ভেতরে দুঃস্বপ্ন দেখার মত মনে হল। ও আশা করেছিল এক্ষুণি ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তারপর দেখবে এসব কিছুই হয় নি। ও আব্বু অথবা আম্মুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। কিন্তু সেটা হল না। ক্যাম্পাসে যেটা ঘটেছে সেটা বাস্তব। এটা মেনে নিতে শারমিনের খুব কষ্ট হচ্ছে।

গোসল করে শারমিন নিচে খেতে গেল। ওর কিছুই ভালো লাগছে না। ভালো ভাবে খেতে পারল না। লায়লা আপুকে বলা উচিত ছিল কিন্তু বলতে পারল না। ওর উদাস ভঙ্গিতে খাওয়া দেখে শায়লা আপু জিজ্ঞেস করল, 'কিরে তোর কি হয়েছে? খাচ্ছিস না কেন? কোনো সমস্যা হলে আমাকে বল।'

তবুও শারমিন শায়লা আপুকে ক্যাম্পাসের ঘটনাটা বলতে পারল না। বললে হয়তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। শায়লা আপুর খুব পাওয়ার। কিন্তু শারমিন কিছু বলতে পারল না। মানুষ অনেক সময় নিজে থেকেই বুকের ভেতরে দুঃখ পুষে রাখে, কখনো প্রকাশ করে না। শারমিনও সেই ভাবে ওর বুকের ভেতর দুঃখের পাশাপাশি ভয় আর আতঙ্ক পুষে রাখল। কারো কাছে প্রকাশ করল না।

দুপুরে খাওয়ার পর নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল শারমিনের। সে শুয়ে পড়ল এবং নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল। আবার হুট করে ঘুম ভেঙে গেল দুঃস্বপ্ন দেখে। ঐ দুঃস্বপ্নটা, একদল নেকড়ে ওকে তাড়া করছে। ও খুব জোরে দৌড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু নেকড়েগুলোর সাথে পেরে ওঠে না। যত জোরে দৌড়াতে চেষ্টা করে তত সে পিছিয়ে পড়ে। তারপর একসময় নেকড়েগুলো ওর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। রোজ সে এটুকুই দেখতে পেত। আজ আরো একটু দেখতে পেল। নেকড়েগুলো ওকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওর হাত-পা, শরীরের মাংস সব

ছিঁড়ে নিচ্ছে, তারপর কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। কি বীভৎস্য দৃশ্য! শারমিনের গা গুলিয়ে আসে। বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে একবার ওর বমি হয়ে গেল।

শারমিন হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্যালকুনিতে গেল। ব্যালকুনিতে দাঁড়াতেই এক ঝাপটা শীতল বাতাস ওর শরীর জুড়িয়ে দিল। কিন্তু মেসের সামনের রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই ওর বুকের ভেতর এমনভাবে ধক করে উঠলো যেন হৃৎপিন্ডটা থেমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল। ইঁদুরের মত এবং হনুমানের মত দেখতে ছেলে দুটো মেসের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। শারমিনকে দেখে অশ্লীল ইঙ্গিত দিল। শারমিন দৌড়ে রুমে ঢুকে গেল। দরজা-জানালা লাগিয়ে পর্দা টেনে দিল।

শারমিন বিছানায় বসে হাঁটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে, সাথে কাঁপছে। ছেলেগুলো মেস পর্যন্ত চলে এসেছে! এখন সে মেস থেকেও বের হতে পারবে না। আবার কাউকে কিছু বলতেও পারছে না। ছেলেগুলো এভাবে বিরক্ত করছে কেন, ওর অপরাধটা কি–শারমিন ভেবে পায় না। শারমিন আরো কুঁকড়ে গিয়ে হাঁটুর মাঝে শক্ত করে মুখ লুকিয়ে ফেলে। এবং হঠাৎ সে লক্ষ্য করে তার চারপাশ অন্ধকার, একেবারে অন্ধকার। কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে শারমিনের মনে হল জগতে যদি এমন কোনো অন্ধকার পাওয়া যেত যেখানে লুকিয়ে থাকলে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, কেউ তাকে খুঁজে পাবে না, কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না তবে সে সেই অন্ধকারে ডুবে যেত। সেরকম অন্ধকারের খোঁজে শারমিন তার হাঁটুর মাঝে আরো শক্ত করে মুখ লুকিয়ে নেয়। আরো অন্ধাকার চায় সে, আরো ঘন অন্ধকার। আরো ঘন এবং আরো...

একজন পুরুষের কান্না

শারমিন হোস্টেলের ছাদে হাঁটাহাঁটি করছে। রোজ বিকেলে সে ছাদে হাঁটাহাঁটি করে। শুধু সে নয়, হোস্টেলের কিছু মেয়ে ছাড়া বাকি সবারই বিকেলের প্রিয় কাজ ছাদে হাঁটাহাঁটি করা নয়তো বসে গল্প করা। কেউ কেউ আবার বিকেলে বই নিয়ে ছাদে চলে আসে। তারপর সেই চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে অবলীলায় পড়ে যায়।

শারমিন হোস্টেলে সিট পেয়েছে মাস দুয়েক হল। এই হোস্টেলে শুধু ফার্স্ট আর সেকেন্ড ইয়ার থাকে। মোটামুটিভাবে সবার সাথেই শারমিনের পরিচয় আছে। কাছাকাছি বয়স হওয়ায় এটা আরো সহজ হয়েছে শারমিনের জন্য। সে তার 'অমিশুক' খেতাবটা ঘুঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে এখানে এসে। বলা যায় সে মোটামুটিভাবে সফল, বেশ কয়েকজন তার বান্ধবী হয়েছে। সে আর চুপচাপ থাকে না, একেবারে অবশ্য লাফাঝাপ দিয়ে বেড়ায় না, যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেটুকুই সে কথা বলে। সে এর মাঝে বুঝে গেছে–যত সে নরম-সরম হয়ে থাকবে তত তাকে অপদস্ত হতে হবে। তাই সে নিজের মাঝে একটা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বলা যায় এখানেও সে সফল।

শায়লা আপুর মেস ছেড়ে শারমিনের আসতে মন চাইছিল না, কিন্তু তাকে আসতে হল। কারণ, মেস থেকে ক্যাম্পাস অনেক দূর হচ্ছিল। তাতে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছিল, পরিশ্রমটাও একটু বেশি হচ্ছিল। এখন সে অনেক সময় বাঁচাতে পারছে। পড়াশোনাতেও বেশি মনোযোগ দিতে পারছে। শুধু পড়াশোনার খাতিরেই শায়লা আপুর মেস ছেড়ে এসেছে শারমিন। তাছাড়া কোনোদিনই সে শায়লা আপুকে ছেড়ে আসত না। এখন সময় পেলেই শারমিন শায়লা আপুর কাছে চলে যায়। শায়লা আপুকে এখন শারমিন অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে। শায়লা আপুর কারণেই সে এখন নির্ভয়ে ক্যাম্পাসে চলাফেরা করতে পারে।

যে ছেলেগুলো তাকে বিরক্ত করত, এখন তারা আর তাকে বিরক্ত করে না। বিরক্ত করবে কি! কোনোভাবে যদি এখন তারা শারমিনের সামনে পড়ে যায় তবে বাপ বাপ করে পালায়। শায়লা আপু এমন সাইজ করেছে না, ওরা শারমিনের আশেপাশেই থাকার সাহস পায় না। শারমিন যদি আগে জানত শায়লা আপুকে বললে ব্যাপারটা এরকম ভাবে ফিনিশ হয়ে যাবে, তবে কি আর সে ঘরের কোণে লুকিয়ে কেঁদে-কেটে একাকার হয়ে যেত!

একদিনের একটা ঘটনা মনে করে শারমিনের খুব হাসি পায়। নিউমার্কেটে সে বই কিনতে গিয়েছিল। বই কিনে যখন ফিরছে, মার্কেটের গেটের কাছে আসতেই দেখে ইঁদুর ও হনুমানের মত দেখতে ছেলে দু'টো মার্কেটে ঢুকছে। শারমিনকে দেখে ওরা এমনভাবে থমকে দাঁড়াল যেন তারা বাঘের সামনে পড়ে গেছে। তারপর পড়িমড়ি করে দিল ছুট। শারমিনও প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন মার্কেটের গেটে দাঁড়িয়েই ফিক করে হেসে ফেলেছিল। সেদিন রিক্সায় করে আসার সময়ও সে কয়েকবার ফিক করে হেসে ফেলেছিল। একবার তো খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। আর তাতে রিক্সাওয়ালা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল যেন সে অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছে।

হোস্টেলের গেটে নেমে রিক্সা ভাড়া দেবার সময়ও তার মুখ হাসি হাসি হয়ে ছিল। তা দেখে রিক্সাওয়ালা শারমিনকে বলেছিল, 'মামা, একটা কথা জিগাই?'

'জিগান।' শারমিন কথা বলার সময়ও মুচকি মুচকি হাসছিল।

'না মানে, আপনার মনে কি খুব আনন্দ? রিক্সায় বসে যেভাবে হাসতেছিলেন আমি তো পরথমে ভাবছিলাম আপনি বুঝি পাগলী। ব্যাপারটা কি কন তো মামা।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মামা, আমার মনে আসলেই খুব আনন্দ। খুব, খুব আনন্দ। কিন্তু ব্যাপারটা আপনাকে বোঝানো যাবে না মামা।' তারপর হাসতে হাসতেই সে রুমে ফিরেছিল।

যতবার তার ব্যাপারটা মনে পড়ে ততবারই সে ফিক করে হেসে ফেলে। একদিন ক্লাসেও সে এভাবে ফিক করে হেসে ফেলেছিল। তারপর সেকি কেলেঙ্কারি! ক্লাসে অমনোযোগী হবার কারণে স্যার তাকে দাঁড় করিয়ে সবার সামনে সেকি অপমান! ক্লাসের কেউ কেউ আবার ভেবেছিল তার মাথার স্ক্রুতে সমস্যা আছে। সেদিনের অপমানের পরেও তার আনন্দে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। ব্যাপারটা মনে পড়লেই তার মনে আনন্দের বাণ ডেকে যায়। সে ফিক করে হেসে ফেলে।

নীল রংয়ের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হুট করে শারমিনের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল এবং ফিক করে হেসে ফেলল। হেসে ফেলেই বুঝতে পারল কাজটা সে ঠিক করে নি। ছাদে এই মুহূর্তে বেশ কয়েকজন উপস্থিত। সবায় অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকাল আর শারমিন অপরাধীর মত ভাব করে সবার দিকে তাকাল।

হোস্টেলে শারমিনের রুমমেট এবং তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রিমি বলল, 'কিরে, তুই এভাবে হেসে ফেললি যে!'

শারমিন কি বলবে বুঝতে পারছিল না। সে মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'না, এমনিই।'

ছাদের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে কয়েকজন বসে আছে। এরা হোস্টেলের গানের দল। এরা যখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে তখন ঐ কয়টা প্রাণী ছাড়া আর কোনো প্রাণী ছাদে থাকতে পারে না, এমনকি কাক-পক্ষী-পোকা-মাকড় পর্যন্ত না। অবশ্য এরা দাবি করে তারা খুব ভালো গান গায়। এই দলের লিডার এবং মেইন ভোকাল সোমা *(যার 'সুরেলা' কণ্ঠের চেয়ে ঘোড়ার ডাক অনেকের কাছে সুমধুর মনে হয়!)* বলল, 'সাধেই কি আর লোকে বলে যে শারমিনের মাথার স্ক্রুতে সমস্যা আছে।'

এই কথা শুনে ছাদের প্রায় সবাই হাসতে লাগল। শারমিন সোমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'আমার সামান্য হাসিতেই সমস্যা? বলি, তোমরা যে গান করো সে গান শুনে যে সবার মাথার স্ক্রু ঢিলা হতে শুরু করে তার কি হবে!'

শারমিনের কথার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সোমা যখন কিছু একটা বলতে যাবে ঠিক তখন ঘটল একটা অদ্ভুত মজার ঘটনা। ছাদের উপর দিয়ে তখন একটা কাক উড়ে যাচ্ছিল। সে তার শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে দিল এবং তা পড়ল গানের দলের হারমোনিয়ামের উপর। সেটা দেখে সবাই হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এর মাঝে একজন বলল, 'দেখেছো, দেখেছো, শারমিনের কথায় একটা কাক পর্যন্ত সমর্থন দিয়ে গেল।'

কথাটা শুনে সবাই এবার এমনভাবে হাসতে লাগল যেন হাসতে হাসতে তারা জান দিয়ে দেবে! কেবল গানের দলের সদস্যারা মুখ কাচুমাচু করে তাদের হারমোনিয়ামটা পরিস্কার করতে লাগল। এই ঘটনাটা বহুদিন এই হোস্টেলের হাস্যরসে টপে থাকবে, এমনকি অন্যান্য হোস্টেলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে!

এই ছাদে আরো দুইটা দল আছে। একটা তর্ক-বিতর্কের দল, আরেকটা ভালো ছাত্রীদের দল। তর্ক-বিতর্কের দল সারাক্ষণ তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত থাকে। রাজনীতির মাঠ থেকে শুরু করে খেলাধূলার মাঠ, সবকিছু নিয়েই তারা তর্ক-বিতর্ক করে। মাঝে মাঝে তর্ক-বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, দেখে মনে হয় এক্ষুণি বুঝি তাদের মধ্যে মারামারি বেঁধে যাবে! কিন্তু তা আর বাঁধে না। এরকম পর্যায়ে পৌঁছার পর তাদের তর্ক-বিতর্কের আয়ু শেষ হয়ে যায়।

ভালো ছাত্রীদের দলটা আবার পড়া ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তারা যেটুকু গল্প করে তার সবটুকুই পড়াশোনা নিয়ে। যখনই তাদের গল্প করতে দেখা যাবে কাছাকাছি না থাকলেও বলে দেয়া যাবে, তারা হয় কোনো বিজ্ঞানীর সূত্র নিয়ে আলোচনা করছে নয়তো কোনো একটা অংককে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আরো কতটা কঠিন করে দেয়া যাবে সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। মাঝে মাঝে এরা এমন ভাব দেখায় যে, মনে হয় এরা বুঝি বিরাট কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছে এবং কিছুদিন পরেই সেটা আবিষ্কার করে ফেলবে, তারপর বিখ্যাত হয়ে যাবে। এই যে একটু আগে ছাদে একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল এই দলটা তার কিছু টের পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ভালো ছাত্রী হিসেবে শারমিনের এই দলটার সাথেই থাকার কথা ছিল। কিন্তু এদেরকে শারমিনের একদম ভালো লাগে না। এরা খুব সহজ জিনিসকে এত কঠিন

করার চেষ্টা করে যে, যে বিজ্ঞানী জিনিসটা আবিষ্কার করেছে সেই বিজ্ঞানী পর্যন্ত ভয় পেয়ে যাবে!

হাসতে হাসতে সবার যখন পেট ব্যথা হয়ে গেল তখন সবাই থামল। এর মাঝে দেখা গেল গানের দলটা গান গাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একজন তখন বিচলিত হয়ে বলল, 'দেখ্, দেখ্, তোরা এখন আবার গান-টান শুরু করিস না! দেখতেই পেলি কাকেরাও তোদের গান পছন্দ করে না!'

দলনেতা সোমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'তোকে এত পটর পটর করতে বলেছে কে? তোকে গান শোনার জন্য আমরা বেঁধে রেখেছি? যার ইচ্ছে হবে গান শুনবি, না ইচ্ছে হবে কানে তুলো দিয়ে রাখবি। কিন্তু বেশি জ্ঞান দিতে আসবি না।'

সোমার কথা শুনে আরেকজন তখন হৈ হৈ করে বলল, 'এহ্, ছাদটা মনে হচ্ছে তোদের একার? তোরা গান গাইলে ছাদে থাকা যায় ভেবেছিস?'

'না থাকা গেলে চলে যাবি, বেশি বক বক করবি না।' মুখ ঝামটা দিয়ে কথাটা বলেই সোমা হারমোনিয়াম বাজানো শুরু করল। তারপর শুরু হল হেরে গলায় গান। আজ আবার রবীন্দ্র সংগীত ধরেছে! ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে নেই! রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আর এই 'গুণী' শিল্পীদের কণ্ঠে তাঁর গান শুনতেন তাহলে নির্ঘাত তিনি গলায় দড়ি দিতেন!

এটা অবশ্য প্রতিদিনের ঘটনা। এত খোঁচা মারা হয় তবুও এদের সংগীত চর্চায় ভাটা পড়ে না। আর হোস্টেলের ছাদটা বেশ বড়, তাই গানের দলটা যখন গান শুরু করে তখন সবাই মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পারে। সেখান থেকেও যদিও ওদের ছাগলের মত ভ্যাবানি কানে আসে তারপরও ব্যাপারটায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আর কোনো সমস্যা হয় না।

শারমিন রেলিংয়ের উপর বসে রিমির সাথে কথা বলছে। অন্যেরাও একে অন্যের সাথে কথা বলছে। তর্ক-বিতর্কের দলটা রেলিংয়ের পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা নিয়ে তর্ক শুরু করে দিয়েছে। ভালো ছাত্রীদের দলটা ছাদের একেবারে অন্য মাথায় চলে গেছে। আর ছাদের ঠিক মাঝখানে গানের দলটা ছাগলের মত ভ্যাবাচ্ছে।

রেলিংয়ের উপর বসে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে শারমিনের চোখে একটা জিনিস ধরা পড়ল। হোস্টেল থেকে বেশ খানিকটা দূরে মাঠে একটা গাছের নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে ভালোভাবে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে লোকটা এই হোস্টেলের দিকেই তাকিয়ে আছে।

শারমিন রিমিকে বলল, 'এই রিমি, একটা জিনিস দেখ্তো।'

'কি দেখবো?'

'ঐযে দূরে, গাছের নিচে কিছু দেখতে পাচ্ছিস?' শারমিন হাতের ঈশারায় দেখিয়ে দিল।

রিমি সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে লোকটা এই হোস্টেলের দিকেই তাকিয়ে আছে।'

'তুই কেমন করে এত জোর দিয়ে বলছিস? দূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সে অন্যদিকেও তাকিয়ে থাকতে পারে! আসলে দূর থেকে দেখলে এরকম মনে হয়।'

'কিন্তু, তুই ভালো করে তাকিয়ে দেখ্, ওইখানে দাঁড়িয়ে লোকটা এই দিকে ছাড়া আর কোনদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে?'

রিমি ভালো করে দেখার চেষ্টা করল। শারমিন-রিমির কথা শুনতে পেয়ে কয়েকজন ওদের কাছে এগিয়ে এলো। একজন বলল, 'কিরে, তোরা কি নিয়ে কথা বলছিস?'

রিমি দূরে সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'দূরে ঐ গাছটার নিচে তোরা কিছু দেখতে পাচ্ছিস?'

সবাই দূরে গাছটার দিকে তাকাল। একজন বলল, 'হ্যাঁ কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।'

রিমি ঐ দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শারমিন বলছে–লোকটা এই দিকে তাকিয়ে আছে। এবং আমারও এখন মনে হচ্ছে–লোকটা এই দিকেই তাকিয়ে আছে।'

সবাই তখন আবার ঐ গাছটার দিকে ঘুরে তাকাল এবং সবারই মনে হল–আসলেই লোকটা এই দিকে তাকিয়ে আছে।

একজন বলল, 'আমার মনে হয় কয়েকদিন থেকেই এই লোকটা আমাদের হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।'

আরেকজন বলল, 'এই লোকটাই কিনা জানি না, তবে আমিও একটা লোককে দেখি। ঠিক হোস্টেলের সামনে না, এই রকম দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।'

সবাই আবার লোকটার দিকে তাকাল। লোকটার চেহারা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে–লোকটা বেশ লম্বা, গায়ের রং কালো, পরনে নীল রঙয়ের হাফ হাতা শার্ট আর কালো রঙয়ের প্যান্ট, ভালোভাবে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে চুলগুলো এলোমেলো এবং লোকটা স্টিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে চড়ছে না।

তাকে নিয়ে গবেষণা চলছে এটা বুঝতে পেরেই কিনা লোকটা উল্টো দিকে হাঁটা দিল। যতক্ষণ না লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ সবাই সেদিকে তাকিয়ে থাকল। লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেলে একজন বলল, 'এইসব লোককে আসলে গুলি করে মারা উচিত। এদের কাজই হল মেয়েদের হোস্টেলের আশেপাশে ঘুর ঘুর করা আর মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা।'

সবাই এই কথায় সম্মতি দিল। শুধু শারমিন মুখ গম্ভীর করে বলল, 'ব্যাপারটা কি অন্য রকমও হতে পারে না?'

সবাই অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকাল। রিমি বলল, 'অন্য রকম কি হতে পারে?'

'সেটা তো বলতে পারব না।'

'তাহলে তোর এমন মনে হল কেন?'

'লোকটা তো কাছে আসে না, দূরে দূরে থাকে। এমন কি হতে পারে না, লোকটা আসলে কাউকে উত্ত্যক্ত করতে আসে না, এর মধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।'

'অন্য কোনো কি ব্যাপার আছে?'

'ধর, লোকটার কোনো বোন হয়তো এই হোস্টেলে থাকে। লোকাটার খুব আদরের বোন হয়তো। তাই দূরে দাঁড়িয়ে এই হোস্টেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকে বোনকে দেখে, সামনে আসতে চায় না বোন কষ্ট পাবে বলে।'

শারমিনের কথা শুনে সবাই হেসে ফেলল। একজন বলল, 'শারমিন, তুই এক কাজ কর, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে ফেল। এক ভাই বোনের হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, বোনের প্রতি ভাইয়ের মমতার এক অনন্য নিদর্শন–জোস কাহিনী হবে! উপন্যাসের নাম দিবি *বোনের জন্য ভাইয়ের ভালোবাসা!*'

'ইয়ারকি করছিস আমার সাথে!' শারমিন গলায় একটু জোর দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা তো এই রকম হতেও পারে!'

রিমি চোখ কটমট করে শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন শারমিন, তুই সবকিছু পজেটিভলি নিস। সবকিছু পজেটিভলি নিতে হয় না, কিছু কিছু ব্যাপার নেগেটিভলি নিতে হয়।' রিমি যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল, 'এই লোক যদি এই হোস্টেলের কারো ভাই হয় তবে আমরা কেউ কি কোনোদিন তাকে দেখব না? প্রতিদিনই তো আমাদের কারো না কারো সাথে কেউ না কেউ দেখা করতে আসে। তাদের অনেককেই তো চিনি। কিন্তু এই লোককে কোনোদিন দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

শারমিন একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু এর মধ্যে অন্য রকম কোনো ব্যাপার থাকা তো অস্বাভাবিক কিছু না!'

কেউ শারমিনের কথায় কান দিল না, সবাই রিমির কথাতেই সম্মতি জানাল–আসলেই ব্যাপারটায় কোনো পজেটিভ দিক নেই, ব্যাপারটা পুরোপুরি নেগেটিভ। এই লোক মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে আসে, এই লোককে গুলি করে মারা উচিত।

কেউ আর এটা নিয়ে কথা বলল না। শারমিনের কথা কেউ বিশ্বাস করল না দেখে সে মুখ গম্ভীর করে বসে থাকল। কারো সাথে কথা বলল না।

রাতের বেলায়ও শারমিন কারো সাথে কথা বলল না। সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল, তাকে ক্ষ্যাপাতে লাগল তবুও সে কারো সাথে কথা বলল না। মুখ গম্ভীর করে বসে থাকল।

সকালে ক্লাসে যাবার জন্য হোস্টেল থেকে বের হয়ে শারমিন এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হোস্টেল থেকে পূর্বদিকে কোণাকুণিভাবে তাকাতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তার সামনের দুইটা গাছ লোকটাকে আড়াল করার চেষ্টা করলেও সে দেখতে পেল। শারমিনের পাশে আরো কয়েকজন ছিল, ওরাও দেখতে পেল।

রিমি শারমিনকে বলল, 'তুই এখনো বলবি, এর মাঝে অন্য কোনো ব্যাপার আছে? অন্য ব্যাপার থাকলে কেউ গাছের আড়ালে এভাবে চোরের মত লুকিয়ে থাকে? এই লোক বখাটে ছাড়া আর কিছুই না।'

শারমিন কোনো কথা বলল না। সে হাঁটতে লাগল।

দুপুর বেলায় হোস্টেলে ফেরার সময়ও দেখা গেল লোকটা একই জায়গায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শারমিন সেদিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে লোকটা নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হল না।

শারমিনের ইচ্ছে হচ্ছিল, লোকটার কাছে গিয়ে জানতে চাইবে–সে এখানে কি করছে, কেন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তার সে সাহস হল না। শারমিন নিজের রুমে ফিরে গেল।

বিকেলে ছাদে উঠে সবাই আশা করেছিল, কোনো না কোনো গাছের আড়ালে অথবা বহুদূরে মাঠের কোনো এক কোণে লোকটাকে দেখা যাবে। কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না। ছাদের সবগুলো কিনারা থেকে যতদূর দেখা যায় তার মধ্যে কোথাও লোকটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না। একজন আবার বাইনোকুলার দিয়ে দেখল। তবুও লোকটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না।

ব্যাপারটা নিয়ে সবার মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেউ বলল, 'লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে।' কেউ বলল, 'শারমিনের কথাই ঠিক। লোকটার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে বলে সে চলে গেছে।' আবার কেউ কেউ বলল, 'লোকটাকে আমরা দেখে ফেলেছি বলে আপাতত সটকে পড়েছে। পরে আবার আসবে।'

দেখা গেল সারা বিকেল সবাই এই বিষয়টা নিয়েই কথা বলে কাটিয়ে দিল। একটা ছাত্রী হোস্টেলের সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকবে, আবার হুট করে হাওয়া হয়ে যাবে–এটা যদি আলোচনার টপ সাবজেক্ট না হবে তবে কোনটা হবে? সবচেয়ে মজা হল তর্ক-বিতর্কের দলটার। এই বিষয়টা নিয়ে তারা তর্ক করতে লাগল। এবং আজও যখন মনে হচ্ছিল, এক্ষুণি তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যাবে ঠিক তখন তাদের তর্কের আয়ু শেষ হয়ে গেল।

তবে, সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটাল গানের দলটা। তারা লোকটাকে নিয়ে একটা মজার গান বেঁধে ফেলল। যারা কোনোদিন এই দলটার কোনো গান শোনে না, তাদের গান গাওয়া নিয়ে টিটকারি মারে, তারাই শেষ পর্যন্ত এই গানটা শুনে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

শারমিনের চোখে কেন জানি ঘুম আসছে না। মাঝে মাঝেই তার এই রকম হয়, রাতে ঘুম আসতে চায় না। এ রকম সময় সে পড়াশোনা করে। আজ তার পড়াশোনা করতে ভালো লাগছে না। আবার ঘুমও আসছে না। কেন এই রকম হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। সে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল।

পায়চারি করতে করতে শারমিন রুমের সাথে লাগানো ব্যালকুনিতে গেল। এই ব্যালকুনিটা হোস্টেলের সামনের দিকে। শারমিন ব্যালকুনিতে দাঁড়াতেই সর্ সর্ করে একটা শব্দ শুনতে পেল। প্রথমে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শব্দ অনুসরণ করে সেদিকে তাকাতেই

দেখে লম্বা একটা ছায়ামূর্তি হেঁটে চলে যাচ্ছে, খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। শারমিনের হাত-পা কাঁপতে লাগল। হঠাৎ করে তার মনে পড়ে গেল এটা অন্য কিছু নয়, এটা সেই লোকটা। লোকটা এত রাতে হোস্টেলের সামনে কি করছিল? বিকেলে তো লোকটাকে দেখা গেল না, রাতে কি করতে এসেছিল? লোকটা কি কোনো বদ মতলব নিয়ে এসেছে? বিভিন্ন প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে শারমিনের মাথার মধ্যে। ছায়ামূর্তিটা মিলিয়ে যাবার পর সে রুমে ফিরে এলো।

রুমে ফিরে আবার পায়চারি করতে লাগল শারমিন। রিমিকে ডেকে তুলে ঘটনাটা বলবে কিনা ভাবতে লাগল। তার এই মুহূর্তে খুব ভয় করছে । লোকটা যদি খারাপ কিছু করে বসে! কিন্তু সে রিমিকে ডেকে তুলল না। এই মুহূর্তে কাউকে কিছু বলবে না ঠিক করল সে। কাল থেকে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করবে–দিনে এবং রাতে দুবেলাতেই। তারপর কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেবে ঠিক করল শারমিন।

সকালে ক্লাসে যাওয়ার সময় শারমিন খুব ভালো করে চারিদিকে তাকাল। কিন্তু কোথাও রহস্যজনক কিছু দেখতে পেল না। অন্যরাও আশেপাশে তাকিয়ে দেখল, কেউ কিছু দেখতে পেল না। সবাই এটা নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। সবাই ধরে নিল লোকটা ভয়ে পালিয়েছে। তারা শুধু লোকটার দিকে একটু তাকিয়েছে, আর তাতেই লোকটা ভয়ে পালিয়ে গেল–ব্যাপারটা চিন্তা করে সবাই যখন গর্বে বুক ফোলাতে শুরু করল তখন শারমিন নিজের মনে মুচকি হাসল। শারমিন জানে, লোকটা পালিয়ে যায় নি, সে রাতে আসে। আজ সারাদিন তাকে দেখা না গেলেও রাতের বেলায় দেখা যাবে। আর কেউ দেখতে পাবে না, শুধু শারমিন দেখতে পাবে।

সত্যি সত্যি দুপুর-বিকাল কোনো সময়ই লোকটাকে আর দেখা গেল না। সবাই যখন ধরে নিল লোকটাকে আর দেখা যাবে না তখন শারমিন মনে মনে তার রাতের পরিকল্পনা ঠিক করে নিল। লোকটা রাতের বেলায় হোস্টেলের সামনে কি করে শারমিনের তা দেখতেই হবে।

আজ সারাদিন শারমিনের অস্থিরতায় কেটেছে। রাতে অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। যতই সময় যাচ্ছে ততই তার অস্থিরতা বাড়ছে। গতকাল শারমিন যখন লোকটাকে দেখেছিল তখন প্রায় রাত দেড়টা বাজে। তাই তার পরিকল্পনা রাত বারোটা থেকে। কিন্তু সমস্যা একটাই–রিমি। শারমিনের যদিও একা একা ভয় করছে, রিমিকে সাথে নিলে মন্দ হয় না তারপরও সে রিমিকে কিছু বলল না। কিন্তু রিমি শারমিনকে চমকে দিল, বলল, 'আজ তোর কি হয়েছেরে শারমিন! তোকে কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে!'

শারমিন কিছুটা রেগে রেগে বলল, 'কে বলেছে অস্থির অস্থির লাগছে, চোখের পাওয়ার বেশি হয়ে গেছে নাকি?'

'তুই-ই বল, আজ সারাদিন তুই কয়টা কথা বলেছিস? সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল তুই কি যেন ভাবছিস। কি হয়েছে তোর বলতো?'

'তাহলে তুই বল, আজ সারাদিন আমার কয়টা কথা বলার প্রয়োজন পড়েছে?'

'মানুষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না? তুই অন্যদিন বলিস না?'

'অন্যদিন বলি বলে যে আজও বলতে হবে সেটা কে বলেছে?'

রিমি একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস তোর কিছুই হয় নি, তুই ঠিক আছিস?'

'হ্যাঁ।' শারমিন শান্ত গলায় উত্তর দিল।

রিমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, তুই ঠিক থাকলেই হল। তোর ব্যাপার তুই বুঝবি, আমার কি?'

রিমি কখনোই বেশি রাত জাগতে পারে না। সে মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়ল। রিমি ঘুমানো পর্যন্ত শারমিন অপেক্ষা করল। হঠাৎ করে শারমিন বুঝতে পারল তার চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। তার ভয় করতে লাগল কিন্তু সে ভয়কে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিল না। আরেকটা ব্যাপার তার মাথায় আসল–গতকাল লোকটা যদি বুঝে ফেলে থাকে যে তার উপস্থিতি কেউ টের পেয়ে গেছে, তবে সম্ভবত লোকটা আজকে আসবে না। তারপরও শারমিন

থেমে যাবে না। সে আগামী দশদিনের জন্য পরিকল্পনা করে নিয়েছে। শারমিনের জানতেই হবে লোকটা রাতে হোস্টেলের সামনে কি করে!

রাত বারোটা উনিশ মিনিটে খুব সাবধানে দরজা খুলে শারমিন ব্যালকুনিতে দাঁড়াল। গতরাতে যেদিকে লোকটাকে দেখেছে সেদিকে তাকাল। কিছু চোখে পড়ল না। সে আরো ভালোভাবে তাকাল, কিছু চোখে পড়ল না। ব্যালকুনি থেকে যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত কোনো মানুষের ছায়া বা এরকম কিছু তার চোখে পড়ল না।

আজ অমাবস্যা নয়, চাঁদনি রাতও নয়। আকাশে মিট মিট করে তারা জ্বলছে। চারপাশ পুরোপুরি অন্ধকার নয়। চোখের দৃষ্টি যতদূর দেয়া সম্ভব ততদূর পর্যন্ত যা কিছু আছে তার সব কিছুর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে শারমিনের চোখ কোনো একটা মানুষের ছায়ামূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা এরকম না হলে রাতের এই নিশ্চুপ প্রকৃতির রূপে সে মুগ্ধ হয়ে যেত।

চারিদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে হোস্টেলের সামনের মাঠটাতে শারমিনের চোখ স্থির হল। মাঠটা অনেক বড়, মাঠের মধ্যেই বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ আছে। সে সব গাছের ছায়া পড়েছে মাঠে। সেই ছায়াগুলো স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। এরকম একটা ছায়া থেকে একটু দূরে খানিকটা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। মনে হচ্ছে সেখানে কিছু একটা আছে। হতে পারে সেটা একটা ইটের উপর আরেকটা ইট রেখে ছেলেরা যে স্ট্যাম্প বানায় তা, হতে পারে সেখানে কিছু একটা রাখা আছে যেটা তেমন মূল্যবান কিছু নয়, আবার হতে পারে সেই লোকটা যাকে দেখার জন্য শারমিন এই রাতে ব্যালকুনিতে দাঁড়িয়ে, যে লোকটা গত রাতে হোস্টেলের একেবারে কাছাকাছি এসেছিল।

শারমিন ব্যালকুনির মেঝেতে বসে পড়ল, শুধু মাথাটা তুলে রাখল গ্রিল পর্যন্ত। তারপর বুভুক্ষের মত তাকিয়ে থাকল সেদিকে। সে এখনো জানে না ওটা কি, তারপরও তাকিয়ে থাকল সেদিকে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক একটু করে মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে সে। কিন্তু কোথাও কোনো অস্বভাবিক ছায়ামূর্তি বা জমাট বাঁধা অন্ধকার দেখতে পেল না। শুধু সামনের মাঠে একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার, শারমিন সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

এভাবে কতক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল শারমিন তা নিজেও জানে না। এভাবে থাকতে থাকতে যখন তার চোখে তন্দ্রা মত এসেছিল ঠিক তখন জমাট বাঁধা অন্ধকারটা নড়ে উঠল। শারমিন স্পষ্ট বুঝতে পারল সেটা নড়ছে। শারমিনও নড়েচড়ে বসল। তার বুক কাঁপছে। সে চোখ কচলে আবার সামনে তাকাল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল আসলেই সেটা নড়ছে।

সেটা নড়তে নড়তে লম্বা হয়ে গেল, তারপর সামনের দিকে এগুতে লাগল। শারমিনের আর সন্দেহ রইল না যে, এই সেই লোকটা। শারমিন বুঝতে পারল তার হাত-পা কাঁপছে, কপালে ঘাম জমে গেছে, বুকের ভেতর ধুক ধুক করে শব্দ হচ্ছে। আর তার মাঝে লোকটা এগিয়ে আসছে। লোকটা হোস্টেলের সামনে এসে কি করে আর কিছুক্ষণের মাঝেই শারমিন সেটা দেখতে পাবে। সেটা কি খুব ভয়ংকর কিছু হবে, না অন্য রকম কিছু হবে? শারমিন এই মুহূর্তে কিছু ভাবতে পারছে না। সে এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের পলক পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেছে সে। এবং সে বুঝতে পারল, এই মুহূর্তে তার খুব ভয় করছে।

লোকটা হোস্টেলের খুব কাছকাছি চলে এসেছে। এখন তাকে মানুষের মত লাগছে, জমাট বাঁধা অন্ধকার লাগছে না। হোস্টেলের মেইন গেটে যে লাইটটা জ্বলছে, সেটা যতদূর পর্যন্ত আলোকিত করছে, লোকটা তার ধারের কাছেও ঘেঁষল না। তাই শারমিন লোকটার চেহারা দেখতে পেল না। এবং লোকটা শারমিনকে অবাক করে দিল। শারমিন ভেবেছিল লোকটা এই হোস্টেলেরই কোথাও আসবে, কিন্তু লোকটা হোস্টেলের ধারের কাছেও ঘেঁষল না। হোস্টেলের সামনে একটা পাকা রাস্তা আছে। শারমিনের হাতের ডানদিকে হোস্টেল থেকে বেশ খানিকটা দূরে সেই রাস্তার উপর একটা জায়গায় উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা।

শারমিন হামাগুড়ি দিয়ে ডানদিকে ব্যালকুনির শেষ মাথায় চলে গেল। তারপর যা দেখল তা শারমিন কল্পনাও করতে পারত না। লোকটা রাস্তার উপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। তারপর উবু হয়ে আদর করার মত ভঙ্গি করে রাস্তার উপর হাত বোলাতে লাগল। শারমিন

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল লোকটার শরীর কাঁপছে, মানে লোকটা কাঁদছে। কাঁদছে আর উবু হয়ে বসে আদর করার মত ভঙ্গি করে রাস্তার উপর হাত বোলাচ্ছে। কল্পনাতীত একটা দৃশ্য, অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার! শারমিনের আর কিছু দেখার ইচ্ছে হল না, দৌড়ে ঘরে চলে গেল। তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

রাতে শারমিন আর ঘুমাতে পারল না। ব্যাপরটা তার মাথার ভেতর কুটকুট করে কামড়াতে লাগল। সে ভেবে পাচ্ছে না–লোকটা কি করছিল ওভাবে, কেন এরকম করছিল? রাস্তার ঐ জায়গাটায় কি ঘটেছিল লোকটার জীবনে? খুব জানতে ইচ্ছে করল শারমিনের। লোকটা দিনে আর আসে না, দিনে আসলে লোকটার সাথে কথা বলা যেত। কিন্তু দিনে যদি লোকটা আর কোনোদিন না আসে তবে কেমন করে লোকটার সাথে কথা বলবে? এই গভীর রাতে তো লোকটার সাথে কথা বলার কোনো উপায় নেই। তাহলে ব্যাপারটা সে জানবে কিভাবে? এসব ভাবতে ভাবতে শারমিনের মাথা ধরে গিয়েছিল। ভোর বেলার দিকে ক্লান্ত হয়ে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

রিমির ডাকাডাকিতে শারমিনের ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেখে রিমি তার উপর ঝুঁকে আছে। শারমিন চোখ খুলেছে দেখে রিমি বলল, 'কিরে, তুই এখনো ঘুমাচ্ছিস যে! তোর তো এতো দেরি কোনোদিন হয় না। সত্যি করে বলতো তোর কি হয়েছে?'

শারমিন কিছু বলল না। একটা হাই তুলে উঠে বসল। তারপর হাঁটুর উপর হাত রেখে, হাতের উপর থুতনি রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রিমি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কি হল কথা বলছিস না কেন?'

তারপর ভূত দেখার মত চমকে উঠে বলল, 'একি! তোর এ অবস্থা কেন? চোখ ফোলা, আবার টকটকে লাল, এলোমেলো চুল, চেহারা পেত্নীর মত! কি হয়েছে তোর? রাতে ঘুমাস নি?'

শারমিন তবুও কথা বলল না। একই ভাবে বসে থাকল। রিমি শারমিনকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার, কথা বলছিস না কেন?'

শারমিন তবুও কোনো কথা বলল না। বিছানা থেকে নেমে টয়লেটের দিকে যেতে লাগল। রিমি খপ করে শারমিনের হাত ধরে বলল, 'দেখ্ শারমিন, আমারা অনেকদিন থেকে এক সাথে একই রুমে থাকি। হুট করে কাল থেকে তোর কি হল তুই আমাকে বলবি না!'

শারমিন রিমির কাছ থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমার কিছুই হয় নি।'

তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রিমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

ক্লাসে মন বসল না শারমিনের। একটা ক্লাস করেই রুমে চলে আসল। তারপর আর জেগে থাকতে পারল না সে, ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর বেলাতেও তার ঘুম ভাঙল না, রিমির ডাকাডাকিতেও না। শুধু ঘুমের ঘোরে রিমিকে বলে দিয়েছে, 'খাব না।'

সন্ধ্যার একটু আগে শারমিনের ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারল তার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। হোস্টেলের নিয়ম অনুযায়ী এখন তার খেতে পাবার কথা নয়, কিন্তু রিমির উদারতায় সে খেতে পেল।

গোগ্রাসে খেয়ে শারমিন বিছানায় হেলান দিয়ে বসে গত রাতের ব্যাপারটা ভাবতে লাগল। রিমি শারমিনকে ঘাঁটাল না, সে আড়চোখে শারমিনকে দেখতে লাগল।

শারমিন নিজেও বুঝতে পারছে সে কিছুটা অস্বভাবিক আচরণ করছে। হুট করে কেউ এরকম হয়ে গেলে যে কারোরই চোখে পড়বে। কিন্তু সে কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছে না, কাউকে কিছু জানাতে পারছে না। কাউকে যে জানাবে, তাকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করাবে কেমন করে? সবাই ভাববে সত্যি সত্যি তার মাথার স্ক্রুতে সমস্যা আছে!

লোকটার সাথে কথা বলা শারমিনের খুব প্রয়োজন। একটা লোক গভীর রাতে ঐ জায়গায় বসে কেন এরকম আচরণ করে সেটা জানার জন্য শারমিন একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে শান্ত করতে পারছে না। সবচেয়ে বড় অস্বস্তি লাগছে লোকটাকে দিনের বেলায় দেখা যাচ্ছে না বলে। দিনের বেলায় লোকটাকে দেখা

গেলেই সে কথা বলতে পারবে। আর তাহলেই সে স্বভাবিক হতে পারবে। তা না হলে সে সম্ভবত পাগলী হয়ে যাবে!

এর ঠিক তিন দিন পর।

ক্লাস শেষে সবাই রুমে ফিরেছে। কারো কারো খাওয়া হয়ে গেছে, কেউ কেউ খেতে বসেছে আর কেউ কেউ খেতে যাচ্ছে। শারমিন হাত-মুখ ধুয়ে খাবার জন্য ডাইনিং রুমে যাবে এরকম সময় একজন এসে বলল, 'দেখ্, দেখ্, রাস্তার উপর একটা লোক কেমন যেন করছে!'

শারমিন চমকে উঠল। আরো কয়েকজন ছিল সেখানে, সবাই ব্যালকুনিতে গিয়ে দাঁড়াল এবং দেখা গেল সত্যি সত্যি একটা লোক রাস্তায় উবু হয়ে বসে আদর করার মত ভঙ্গি করে রাস্তার উপর হাত বোলাচ্ছে আর কাঁদছে।

শারমিন বুঝে ফেলল এই সেই লোকটা, যার কারণে তার মাথা খারাপ অবস্থা, মনে প্রশ্নের পাহাড়। শারমিন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে আসল। আজ তাকে জানতেই হবে–লোকটা কেন এরকম ভাবে রাস্তায় বসে থাকে, কি সেই রহস্য? শারমিনের এভাবে ছুটে বেরিয়ে আসা দেখে সবাই হতবাক! শারমিনের পিছু পিছু তারাও বেরিয়ে এলো।

শারমিন দৌড়ে গিয়ে লোকটার পাশে দাঁড়াল। লোকটা চমকে উঠল, তার মুখ হা হয়ে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে হা করে শারমিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে–এতক্ষণ আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এই মাত্র টুপ করে পড়ে গিয়েছে! এখন কিছু চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না!

শারমিন লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি এখানে কি করছেন?'

'আমি, আমি–' লোকটা কিছু বলতে পারল না, আমতা আমতা করতে লাগল।

বেশ কয়েকজন শারমিনের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের দেখে লোকটা আরো হতভম্ব হয়ে গেছে। কয়েকজনের মধ্যে থেকে রাগী ধরনের একটা মেয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'কি হল কথা বলছেন না কেন? বলেন, এখানে কি করছিলেন?'

লোকটা আমতা আমতা করে বলল, 'না, মানে–' লোকটা একটু দম নিয়ে, একটা ঢোক গিলে বলল, 'আমার টাকা হারিয়ে গেছে। আমি টাকা খুঁজছিলাম।'

শারমিন তো বটেই, অন্যেরাও বুঝতে পারল লোকটা মিথ্যে বলছে।

রাগী মেয়েটা আবার ধমক দিয়ে বলল, 'কয় টাকা হারিয়েছে?'

'এই–' লোকটা একবার ঢোক গিলে বলল, 'এক টাকা।'

'এক টাকা!' মেয়েটা তার মুখ বিকৃতি করে বলল, 'কয়েন না নোট?'

'কয়েন।' লোকটা হাসি হাসি মুখ করে বলল।

'ও!' রাগী মেয়েটা সবাইকে উদ্দেশ্য করে কিছুটা ব্যঙ্গ করে বলল, 'এই তোরা একটু মিয়া সাহেবকে সাহায্য করতো, উনার মহামূল্যবান এক টাকার কয়েন হারিয়ে গেছে!'

সবাই তখন টাকা খোঁজার ভান করতে লাগল। একজন আবার, 'পেয়েছি! পেয়েছি!' বলে চিৎকার করতে লাগল। তারপর একটা টিনের পাত কুড়িয়ে এনে লোকটার মুখের সামনে ধরে বলল, 'দেখুন তো, এটা আপনার এক টাকা কিনা?'

সবাই তখন হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। লোকটার মুখে অপমানের স্পষ্ট ছাপ পড়ল। শারমিনের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। সে সবাইকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোরা এসব কি করছিস? একটু থাম তোরা।'

'কেন থামবো? তোর কি মনে হয় এই লোক সত্যি কথা বলছে?' রিমি বলল।

'আমি সেটা বলছি না। আমি জানি এই লোক মিথ্যে বলছে। কিন্তু–'

শারমিন কথা শেষ করার আগেই লোকটা বলল, 'আমি মিথ্যে বলছি না। সত্যিই আমার টাকা হারিয়ে গেছে, আমি টাকা খুঁজছি।'

শারমিন সারাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাতেও কি আপনার টাকা হারিয়ে যায়?'

লোকটা তো বটেই, বাকি সবাই-ই অবাক হয়ে গেল। রাগী মেয়েটা গলায় বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'এই লোক রাতেও আসে!'

'হ্যাঁ।'

'তুই কিভাবে জানলি!'

'আমি নিজে দেখেছি।'

লোকটার মুখে এবার ভয়ের স্পষ্ট ছাপ পড়ল। সে কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। রিমি লোকটার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এটা কি সেই লোকটা যাকে আমরা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম?'

শারমিন বলল, 'হ্যাঁ।'

রাগী মেয়েটা মুখ বিকৃতি করে বলল, 'ছি! আপনার একটুও লজ্জা করে না মেয়েদের একটা হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে?'

লোকটা কি বলতে গিয়েও থেমে গেল।

রাগী মেয়েটা আবার বলল, 'আপনার বোন যদি আজ এই হোস্টেলে থাকত তাহলে কি পারতেন রাত-বিরেতে হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে?'

হঠাৎ করে লোকটা কেমন যেন হয়ে গেল। তার দৃষ্টি পাল্টে গেল, মুখ শক্ত হয়ে গেল, শরীর একবার ঝাঁকুনি দিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল। লোকটাকে দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। রাগী মেয়েটা ভয় ভয় গলায় বলল, 'কি হল আপনার, এরকম করছেন কেন?'

লোকটা কোনো কথা বলল না। চোখ দুটো বড় বড় করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

শারমিন লোকটাকে শান্ত করার জন্য বলল, 'দেখুন আপনি রেগে যাবেন না। আমরা শুধু জানতে চাইছি আপনি এখানে কি করছিলেন?'

লোকটা মেঘ স্বরে বলল, 'জানতে চান, জানতে চান আমি কি করছিলাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানতে চাই। সত্যি করে বলেন আপনি এখানে কি করছিলেন? রাতে এসে কি করেন? কেন ওভাবে রাস্তায় বসে থাকেন? কেন কাঁদেন?' শারমিন এক নিঃশ্বাসে বলল। সে হাঁপাতে লাগল। কয়েকদিন ধরেই এই প্রশ্নগুলো তার মাথার ভেতর কুটকুট করে কামড়াচ্ছিল!

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। মাথা একবার নামিয়ে আবার তুলে বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে লোকটা বলল, 'নয় বছর আগের কথা। আমাদের একটা বোন ছিল–মায়া। আমাদের তিন ভাইয়ের একটাই ছোট বোন মায়া। এই ভার্সিটিতে পড়ত। এই হোস্টেলে থাকত। এই হোস্টেল, এই হোস্টেলেই থাকত।' লোকটা এমন ভাবে হোস্টেলটা দেখাল যেন এরা সবাই আজই প্রথম হোস্টেলটা দেখছে।

'খুব আদরের ছিল বোনটা আমাদের। ছোট থেকেই পড়াশুনায় ভালো ছিল। ওকে নিয়ে আমাদের সবার অনেক আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল। এই ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর ওকে নিয়ে যখন আমরা আরো বড় স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম ঠিক তখন–'

লোকটা অনিশ্চিত একটা দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক তখন ওর দিকে শকুনের নজর পড়ল!'

'শকুন!' একসাথে কয়েকজন বলল।

'হ্যাঁ, শকুন! সেই শকুনগুলো আমার বোনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। রাস্তা-ঘাটে যখন তখন ত্যক্ত করত। সে ভয়ে ক্লাসে যেতে পারত না। হোস্টেলের সামনে এসেও আজেবাজে কথা বলত।'

'আমরা ভিসির কাছে অভিযোগ জানালাম। তারা অভিযোগ নিল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নিল না। অভিযোগের কথা শুনে ওরা আরো ক্ষেপে গেল। একদিন ওরা আমার বোনকে অপমান করার চেষ্টা করল। ভার্সিটির ভেতরে সবার সামনে ওকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করল। বোনটা আমার সহ্য করল না। পায়ের সেন্ডেল খুলে ওদের গালে চর মারল। সেই সময় কয়েকজন এগিয়ে এসেছিল বলে জানোয়ারগুলো আর কিছু করতে পারে নি। কিন্তু যাবার সময় হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল–ওরা মায়াকে খুন করবে।'

'আমরা আবার অভিযোগ করলাম। ওরা বলল–ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু একদিন যায়, দুইদিন যায়, মাস চলে যায় তবুও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এদিকে মায়া ক্লাসে যেতে পারে না, পড়াশুনা করতে পারে না। এভাবে যখন আমাদের স্বপ্ন ভেঙে যেতে লাগল তখন একদিন মায়া ঠিক করল–সে আর ভয় পাবে না। ক্লাসে যাবে, পড়াশুনা করবে।'

লোকটা একটু দম নিল। সবাই চুপ করে লোকটার কথা শুনেছে, কেউ কোনো শব্দ করছে না।

'কিন্তু সে পারল না। শকুনগুলোর ডানার ঝাপটার শক্তির সাথে মায়া পেরে উঠল না।' লোকটার গলা একটু কেঁপে উঠল।

'এই মাসেরই এইরকম এক দুপুরে মায়া ক্লাস করে হোস্টেলে ফিরছিল। আরো কয়েকজন ছিল মায়ার সাথে। সবাই যখন এই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, আর একটু হলেই যখন হোস্টেলে ঢুকে যাবে ঠিক তখন একটা মাইক্রোবাস প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসল পেছন থেকে। মাইক্রোবাসটাকে ছুটে আসতে দেখে সবাই রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিল, কিন্তু বাসটা ওদের ভেতরেই হামলে পড়ল। ওদের টার্গেট ছিল মায়া, ওরা গাড়িটা মায়ার উপর তুলে দিল, মায়া ছিটকে পড়ল, গড়াগড়ি খেতে খেতে এইখানে এসে থামল–'

লোকটা ধপ করে বসে পড়ল রাস্তার সেই জায়গাতে যেখানে সে হাত বোলায়, তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'এইখানে মায়া পড়ে ছিল, রক্তে ভিজে গিয়েছিল রাস্তার এই জায়গাটা। ঠিক এইখানে আমার মায়া মরে পড়ে ছিল। কেউ এগিয়ে এসে তাকে একটু স্পর্শও করে নি, কেউ হাসপাতালে নিতে এগিয়ে আসে নি।'

'আর কারো কিছু হয় নি?' শারমিন বলল।

'আরো দুইটা মেয়ে আহত হয়েছিল। একজন একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে।'

'তারপর কি হল?' রিমি বলল।

'তারপর–' লোকটা একটু থামল, 'তারপর–যখন আমরা খবর পেয়েছি তখন বিকেল হয়ে গেছে। ততক্ষণ মায়া এখানে পড়ে ছিল। আমি ওর লাশ নিয়ে ভিসির কাছে গেলাম। আমি একা, কেউ আসল না আমার সাথে। এতজন দেখল তবুও কেউ আসল না। আমারে বলার সময় কতজন কথা বলল কিন্তু ভিসির কাছে যাওয়ার সময় সবাই বোবা হয়ে গেল, সবকিছু সবাই ভুলে গেল।'

'ভিসি আমার হাতে দুই হাজার টাকা দিয়ে বলল–বোনের লাশ দাফন করতে, পরে ব্যবস্থা নেবে। আমি বুঝে গেলাম এরা সব জানোয়ার, এরা টাকার কাছে বিক্রি হয়ে আছে। আমি ভিসির মুখের উপর দুই হাজার টাকা ছুঁড়ে দিয়ে মায়ার লাশ নিয়ে চলে আসলাম। দাফন করলাম।'

'আপনি থানায় কেস করেন নি?' রাগী মেয়েটা বলল।

'না।'

'কেন?'

'কোনো লাভ হইত ভেবেছেন! এই হোস্টেলের কেউ পুলিশের কাছে সাক্ষী দিতে রাজি হয় নাই।'

'তাই বলে কেস করবেন না!'

লোকটা রূঢ় একটা হাসি দিয়ে বলল, 'দুনিয়া খুব কঠিন জায়গা। এই জায়গাটা সহজ করতে হইলে টাকা লাগে, ক্ষমতা লাগে। আমাদের সেই টাকা নাই, ক্ষমতাও নাই। তাই কেস করেও কোনো লাভ নাই। আমরা কেস করি নাই। এই ভার্সিটির কেউ যখন পুলিশের কাছে মুখ খুলতে চায় নি তখন এইটা প্রমাণ করতাম কেমন করে? পত্রিকাতেও তো এই খবর ছাপা হয় নাই!'

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শারমিন নিরবতা ভাঙ্গল, 'আপনি কি সব সময়ই এইখানে আসেন?'

লোকটা আস্তে করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'না। শুধু এই মাসে আসি। এসে এখানে বসে থাকি। যদি মায়ার অতৃপ্ত আত্মার দেখা পাই! মায়ার আত্মার কাছে আমার ক্ষমা চাইতে হবে, তার খুনের বিচার আমি এই দুনিয়ায় করতে পারি নাই, সে আমারে যেন ক্ষমা কইরা দেয়–এই কথা তারে আমার বলতে হবে।'

'দেখা পেয়েছেন?' শারমিন আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'নাহ্, পাই নাই।' লোকটা একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'মনে হয় আমার উপর রাগ করে আছে। আমি ভাই হয়ে তারে রক্ষা করতে পারি নাই, তার খুনের বিচার করতে পারি নাই, আমার উপর তো রাগ হইতেই পারে! তবুও এসে বসে থাকি, যদি কোনোদিন রাগ ভাঙে!' লোকটার চোখ ছলছল করে উঠল।

এরপর কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে।

রাগী মেয়েটা লোকটার একটু কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি না বুঝে আপনাকে অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছি। প্লিজ, আমাকে মাফ করে দেবেন।'

লোকটা একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, মাফ চাওয়ার কি আছে? যে কেউই এরকম বলবে। আপনার কোনো দোষ হয় নাই। আপনারাই বরং আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি আপনাদের কষ্ট দিলাম। আমি তো কষ্টে আছিই, এখন থেকে মনে হয় আপনারাও এই ব্যাপারটা নিয়ে কষ্টে থাকবেন।'

শারমিন দেখতে পেল লোকটার চোখ ছলছল করে উঠল। সে ব্যাপারটা অন্যদিকে নেয়ার জন্য বলল, 'আপনি দুপুরে খেয়েছেন?'

'না, খাই নাই।'

'আমরাও অনেকে এখনো খাই নি।' শারমিন লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি?'

'বলেন।'

'আপনি আজকে আমাদের সাথে খেয়ে যান।'

'না, না, দরকার নাই।'

'কেন দরকার নাই? প্লিজ খেয়ে যান।'

'আপনেরা বললেন এইটাই যথেষ্ট। আমি খুব খুশি হলাম। আসলে এখন আমার খিদে নাই।'

'আপনি মিথ্যে বলছেন।' রাগী মেয়েটা বলল।

রিমি এগিয়ে এসে বলল, 'প্লিজ চলেন, আমাদের সাথে একটু খাবেন। প্লিজ ভাইয়া।'

সবাই দেখতে পেল লোকটা চমকে উঠল, হঠাৎ করে তার শরীর একটু দুলে উঠল। সম্ভবত অনেকদিন পর তাকে কোনো মেয়ে এভাবে অনুনয় করে ভাইয়া ডাকল। লোকটার চোখ দুটো মনে হল ছলছল করে উঠল।

রিমির পর শারমিনও লোকটাকে আবদার করে বলল, 'প্লিজ ভাইয়া চলেন। প্লিজ...'

লোকটা আবার চমকে উঠল। কোনো কথা বলল না।

শারমিন এবার একটু অনুযোগ করে বলল, 'আজ যদি আপনার বোন এই হোস্টেলে থাকত, সে যদি আপনাকে খেয়ে যেতে বলত তাহলে কি আপনি না করতে পারতেন? ধরে নিন আমরাই আপনার বোন। আজকে আমাদের সাথে একটু খেয়ে যান, প্লিজ ভাইয়া।'

লোকটা নিজেকে আর সামলাতে পারল না। দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। সবাই অবাক হয়ে দেখছে–এতগুলো মেয়ের সামনে একজন পুরুষ মানুষ ভেউ ভেউ করে কাঁদছে!

কান্নার শব্দ একটু বেড়ে গেল। কান্নার শব্দে হোস্টেলের ভেতর থেকে আরো কয়েকজন বেরিয়ে এলো। তারা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই ভরদুপুরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে একটা মানুষ দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে!

একজন পুরুষ মানুষ!